ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনা
Planning in Management

ইউনিট ৪

পরিকল্পনা হলো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কি কাজ করতে হবে এ সম্পর্কে ধারণা তৈরী ও বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করা। একজন ছাত্র তার শিক্ষা জীবনের শুরুতে মনে মনে কল্পনা করে নেয় কর্মজীবনে সে কোন পেশা গ্রহণ করবে এবং তার পছন্দসই পেশা অর্জনের জন্য তাকে কি ধরনের লেখাপাড়া করতে হবে, কেমন পরিশ্রম করতে হবে, খরচ কোথা থেকে আসবে,এর জন্য সে কোন্ কোন্ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার পড়ালেখা সমাপ্ত করবে ইত্যাদি। তাকে আগে থেকেই কল্পনা করে রাখতে হবে। এবং এই সব কর্ম পদ্ধতি কোন প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করবে তা পূর্বেই ঠিক করা হচ্ছে পরিকল্পনা। পরিকল্পনা হলো ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ		
পাঠ-৪.১	:	পরিকল্পনার সংজ্ঞা, পরিকল্পনার প্রকৃতি , পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা
পাঠ-৪.২	:	পরিকল্পনার প্রকারভেদ, পরিকল্পনার পদক্ষেপসমূহ, উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য সমূহ
পাঠ-৪.৩	:	ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য, নীতি, কৌশল ও লজিষ্টিক্স; কৌশল ও নীতির উৎসসমূহ, কৌশল ও নীতির মৌলিক প্রকারভেদ
পাঠ-৪.৪	:	ফলপ্রসূ কৌশল উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ, মুখ্য কৌশলের ক্ষেত্রসমূহ , মুখ্য কৌশলসমূহের উন্নয়ন
পাঠ-৪.৫	:	লজিস্টিক্সের গুরুত্ব, লজিস্টিক্স নির্ধারণের বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ, কৌশল ও লজিস্টিক্সের তুলনা

পাঠ-৪.১ পরিকল্পনার সংজ্ঞা, পরিকল্পনার প্রকৃতি ,পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা
Definition of Planning, Nature of Planning, Importance of Planning

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিকল্পনার প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

পরিকল্পনার সংজ্ঞা
Definition of Planning

পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার প্রথম ও প্রধান ধাপ। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যাবলী নির্ণয় এবং তা অর্জনের জন্য করণীয় কাজ নির্ধারণের সাথে পরিকল্পনা জড়িত। এটি ভবিষ্যৎ কার্যের একটি নক্সা বা প্রতিচ্ছবি। ভবিষ্যতে একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য কি কি কাজ করতে হবে, কিভাবে, কোথায়, কখন এবং কত সময়ে এই কাজ শেষ করতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াই হচ্ছে পরিকল্পনা।

অন্যভাবে বলা যায়, পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি প্রক্রিয়া। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন্ কাজ কখন, কিভাবে, কার দ্বারা সম্পাদন করা হবে, এসব বিষয়ের পূর্ব-নির্ধারিত কর্মসূচিকে পরিকল্পনা বলে। একজন ছাত্র তার শিক্ষা জীবনের শুরুতে মনে মনে কল্পনা করে নেয় কর্মজীবনে সে কোন পেশা গ্রহণ করবে এবং তার পছন্দসই পেশা অর্জনের জন্য তাকে কি ধরনের লেখাপাড়া করতে হবে, কেমন পরিশ্রম করতেহবে, খরচ কোথা থেকে আসবে,এর জন্য সে কোন্ কোন্ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার পড়ালেখা সমাপ্ত করবে ইত্যাদি। তাকে আগে থেকেই কল্পনা করে রাখতে হবে এবং এই সব কর্ম পদ্ধতি কোন প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করবে তা পূর্বেই ঠিক করা হচ্ছে পরিকল্পনা।

বিভিন্ন মনিষী পরিকল্পনাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলঃ

হেনরি ফেয়ল- তাঁর General and Industrial Management গ্রন্থে বলেন, "পরিকল্পনা হল ভবিষ্যত নির্ধারণ করা এবং তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।"

এইচ. অইরিখ ও এইচ. কুঞ্জএর মতে, 'ব্রত ও লক্ষ্য নির্বাচন এবং এগুলো অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের সাথে পরিকল্পনা জড়িত; এর জন্য প্রয়োজন সিদ্ধান্ত গ্রহণ অর্থাৎ বিকল্প কর্মপন্থা হতে উত্তম কর্মপন্থা নির্বাচন'(Planning involves selecting missions and objectives and the actions to achieve them; it requires decision making, that is, choosing future courses of action among alternatives) |

ডাব্লিউ.এইচ. নিউম্যান এর মতে, 'কি করা হবে সে বিষয়ে অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে পরিকল্পনা বলে'(Planning is deciding in advance what is to be done) |

আর. এন ফার্মার ও ব্যারি এম. রিচম্যান এর মতে, 'সাংগঠনিক কোন কাজের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে পরিকল্পনা বলে' (The planning is the process of making decision for any phase of organisational activity) |

টেরী এবং ফ্রাংকলিন- এর মতে, পরিকল্পনা হলো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ কি করতে হবে এ সম্পর্কে ধারণা তৈরী ও বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করা।"

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিকল্পনায় কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়–

১. পরিকল্পনা সর্বদা ভবিষ্যতের জন্য করা;
২. এটি ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক কাজ;
৩. এটি বিভিন্ন বিকল্প কার্যধারা নির্ধায়ক;
৪. এতে অতীত অভিজ্ঞতায় প্রতিফলন ঘটে;
৫. এটি কার্য সম্পাদনের মাত্রা বা রোডম্যাপ।

সুতরাং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে কোন্ কাজ কখন, কার দ্বারা, কিভাবে সম্পাদিত হবে এ সম্পর্কে পূর্বঅভিজ্ঞতা ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত কার্যসূচি প্রণয়নের প্রক্রিয়াই হলো পরিকল্পনা। পরিকল্পনা একটি গতিশীল, যুক্তিগ্রাহ্য, মানসিক এবং বুদ্ধিদীপ্ত একটি প্রক্রিয়া যা কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য স্থির এবং ঐ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে করণীয় সবচেয়ে সম্ভাব্য উপযুক্ত কর্মসূচী প্রণয়ন করে।

পরিকল্পনার প্রকৃতি
Nature of Planning

ব্রত ও লক্ষ্য নির্বাচন এবং এগুলো অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের সাথে পরিকল্পনা জড়িত। এর জন্য প্রয়োজন সিদ্ধান্ত গ্রহণ অর্থাৎ বিকল্প কর্মপন্থা হতে উত্তম কর্মপন্থা নির্বাচন পরিকল্পনার কিছু স্বকীয়তা রয়েছে। নিম্নোক্ত বিষয়াদী আলোচনার মাধ্যমে আমরা পরিকল্পনার প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করার চেষ্টা করবো ঃ

(১) লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা ঃ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় প্রতিষ্ঠানের কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করার জন্য। যেমন, ধরুন আপনি একটি ফার্মের ব্যবস্থাপক হিসেবে ঠিক করলেন যে এ বছর ১০,০০০ টাকা লাভ করবেন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপনি এমনভাবে উৎপাদনের পরিকল্পনা করবেন যেন লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য সঠিক সময়ে উৎপাদন করা যায়। পাশাপাশি বিক্রয় পরিকল্পনা এমন ভাবে করবেন যাতে সঠিক পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করে লক্ষ্য অর্জন করা যায়। এছাড়া আপনি লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবেন।

(২) পরিকল্পনার অগ্রগণ্যতা ঃ ব্যবস্থাপনা কার্যাবলীর মধ্যে পরিকল্পনা হলো একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কার্য। পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করেই অন্যান্য কার্যাবলী যেমন, সংগঠন, নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। পরিকল্পনা ছাড়া অন্যান্য কার্যাবলীর প্রশ্নই ওঠে না। অতএব পরিকল্পনা হলো ব্যবস্থাপনার সর্বপ্রথম কার্য।

(৩) পরিকল্পনার সর্বস্তরীয় ব্যবহার ঃ পরিকল্পনার শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ স্তরের ব্যবস্থাপকদেরই দায়িত্ব নয় বরং সংগঠনের প্রত্যেক স্তরের ব্যবস্থাপকদেরই এ দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাই পরিকল্পনার ব্যবহার প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরে লক্ষ্য করা যায়।

(৪) উদ্দেশ্য অর্জনে অবদান ঃ পরিকল্পনা উদ্দেশ্যের উপর আলোকপাত করে। প্রত্যেক পরিকল্পনার মূখ্য লক্ষ্য হলো সাংগঠনিক উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করা। পরিকল্পনা উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে একটি সর্বাঙ্গীন সমন্বিত ও সঙ্গতিপূর্ণ কার্যের কাঠামো সৃষ্টি করে।

(৫) পরিকল্পনার দক্ষতা ঃ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। একটি পরিকল্পনাকে তখনই দক্ষ বলা যায়, যখন তা মিতব্যায়ীতার সাথে উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে। তাই সুষ্ঠু ও দক্ষ পরিকল্পনাকে এমন হতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ রক্ষার মাধ্যমে স্বল্প তম ব্যয়ে অধিক ফল লাভ করা সম্ভব হয় এবং সফলতা লাভ করা যায়।

(৬) পরিকল্পনার নিরবচ্ছিন্নতা ঃ ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনার ব্যপ্তি বিরামহীন। প্রতিটি প্রশাসনিক কার্যের কোন না কোন স্থানে

কোন না কোন প্রকার পরিকল্পনার ব্যবহার করা হয়। কারণ ব্যবসায় পরিবেশ সর্বদাই পরিবর্তিত হচ্ছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেও পরিকল্পনাকে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করা যায়।

(৭) **পরিকল্পনার যৌক্তিকতা ঃ** পরিকল্পনা হতে হবে বাস্তব ভিত্তিক এবং যুক্তিসঙ্গত। পরিকল্পনা কখনও আবেগ বা কল্পনা প্রসূত হবে না। কোনই অবাস্তব চিন্তাকে পরিকল্পনা বলা যায় না। অর্থাৎ পরিকল্পনা সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রণয়ন করতে হবে, যে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

(৮) **পূর্বানুমান নির্ভর ঃ** পরিকল্পনা পূর্বানুমানের উপর নির্ভরশীল। পূর্বানুমান সঠিক হলে অপরিকল্পনাও সঠিক হবে। অন্যথায়, পরিকল্পনা কোনো কাজেই আসবে না। তাই পূর্বানুমান যথাসম্ভব সঠিক হওয়া আবশ্যক।

(৯) **মানসিক প্রতিচ্ছবি ঃ** পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের ভবিষ্যৎ কর্মসূচির একটি মানসিক প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে। এটি প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ভবি্যত কার্যাবলির ত্রি তুলে ধরে।

(১০) **পরিকল্পনা সময়ভিত্তিক ঃ** পরিকল্পনা সবসময় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়। উক্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট কার্যসম্পাদন করতে হয়। অন্যথায়, সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

Importance of Planning

প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য অনেকাংশেই পরিকল্পনার সাফলতার উপর নির্ভরশীল। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজেই সাফলতা আসে না। কি ব্যক্তি জীবনে, কি সমাজ জীবনে, কি ব্যবসায়, কি রাষ্ট্রীয় কাজে সর্বক্ষেত্রেই পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবস্থাপক ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে। পরিকল্পনা সঠিক সময়ে সঠিকভাবে প্রণয়ন করলে ভবিষ্যতের বিভিন্ন ঘটনা নিরবে মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না। একমাত্র সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই ব্যব্যবস্থাপকগণ ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। নিেত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিকল্পনার গুরুত্বকে তুলে ধরা হলো ঃ

(১) পরিকল্পনা দিক নির্দেশনা দেয় ঃ অর্থাৎ পরিকল্পনা বলে দেয় যে, উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কিভাবে কোন দিকে এবং কখন কি কার্যাবলী পরিচালনা করতে হবে।

(২) পরিবর্তিত অবস্থার মোকাবিলা করা ঃ ব্যবসায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের কারণে নানারকম সমস্যা দেখা যায়। সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে এ সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করা যায়।

(৩) সমন্বয়ের সুবিধা ঃ প্রতিষ্ঠানের বিভাগ, উপ বিভাগ ও অনুবিভাগের পরিকল্পনা সমূহের সমন্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগের কর্মকাণ্ড পরিকল্পনা মাফিক পরিচালিত হয়। এতে স্বয়ংক্রিয় ভাবে সুসমন্বিত ফলাফল লাভ করা সহজতর হয়।

(৪) মিতব্যয়িতা অর্জনে সহায়তা ঃ সুষ্ঠু ও সঙ্গতিপূর্ণ কার্যাবলীর উপর গুরুত্বারোপের মাধ্যমে পরিকল্পনা মিতব্যয়িতা অর্জনে সহায়তা করে। অর্থাৎ পরিকল্পনার ফলে দক্ষতার সাথে কাজ করা যায় যা মিত্যব্যয়িতা অর্জনে সাহায্য করে।

(৫) উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের হাতিয়ার ঃ পরিকল্পনা মূলতঃ উদ্দেশ্য কেন্দ্রানুগ। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য ঠিক মত বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং ইহা বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়।

(৬) নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা ঃ নিয়ন্ত্রণের মৌল ভিত্তি হলো পরিকল্পনা। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতিত নিয়ন্ত্রণ কখনই সুষ্ঠু হতে পারে না। যে স্তর পর্যন্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব ঠিক সেই স্তর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া কার্যকর করা সম্ভব হয় অর্থাৎ পরিকল্পনার অনুপস্থিতিতে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ কার্য চালানো সম্ভব নয়।

(৭) পূর্বানুমান নির্ভর : পরিকল্পনা পূর্বানুমানের উপর নির্ভরশীল। পূর্বানুমান সঠিক হলে পরিকল্পনাও সঠিক হবে। অন্যথায়, পরিকল্পনা কোনো কাজেই আসবে না। তাই পূর্বানুমান যথাসম্ভব সঠিক হওয়া আবশ্যক।

(৮) মানসিক প্রতিচ্ছবি : পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের ভবিষ্যৎ কর্মসূচির একটি মানসিক প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে। এটি প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ভবিষ্যত কার্যাবলির চিত্র তুলে ধরে।

(৯) পরিকল্পনা সময়ভিত্তিক : পরিকল্পনা সবসময় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়। উক্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদন করতে হয়। অন্যথায়, সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনার সংজ্ঞা, পরিকল্পনার প্রকৃতি, পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বিবরণ খাতায় লিখুন এবং আপনার জ্ঞান ঝালাই করে নিন।

সারসংক্ষেপ:

পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার প্রথম ও প্রধান ধাপ। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যাবলী নির্ণয় এবং তা অর্জনের জন্য করণীয় কাজ নির্ধারণের সাথে পরিকল্পনা জড়িত। এটি ভবিষ্যৎ কার্যের একটি নক্সা বা প্রতিচ্ছবি। ভবিষ্যতে একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য কি কি কাজ করতে হবে, কিভাবে, কোথায়, কখন এবং কত সময়ে এই কাজ শেষ করতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি প্রক্রিয়াই হচ্ছে পরিকল্পনা। প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য অনেকাংশেই পরিকল্পনার সাফলতার উপর নির্ভরশীল। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজেই সাফলতা আসে না। কি ব্যক্তি জীবনে, কি সমাজ জীবনে, কি ব্যবসায়, কি রাষ্ট্রীয় কাজে সর্বক্ষেত্রেই পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবস্থাপক ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে। পরিকল্পনা সঠিক সময়ে সঠিকভাবে প্রণয়ন করলে ভবিষ্যতের বিভিন্ন ঘটনা নিরবে মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না। একমাত্র সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই ব্যব্যবস্থাপকগণ ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।

পাঠ-৪.২ পরিকল্পনার প্রকারভেদ, পরিকল্পনার পদক্ষেপসমূহ, উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ

Types of Planning, Steps of Planning, Characteristics of Effective Planning

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিকল্পনার প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিকল্পনার পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

পরিকল্পনার প্রকারভেদ

Types of Planning

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে কোন্ কাজ কখন, কার দ্বারা, কিভাবে সম্পাদিত হবে এ সম্পর্কে পূর্বঅভিজ্ঞতা ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত কার্যসূচি প্রণয়নের প্রক্রিয়াই হলো পরিকল্পনা। পরিকল্পনা একটি গতিশীল, যুক্তিগ্রাহ্য, মানসিক এবং বুদ্ধিদীপ্ত একটি প্রক্রিয়া যা কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য স্থির এবং ঐ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে করণীয় সবচেয়ে সম্ভাব্য উপযুক্ত কর্মসূচী প্রণয়ন করে।পরিকল্পনারকে তার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

(ক) সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা (On the basis of time period)

(খ) ব্যবহারের মাত্রার ভিত্তিতে পরিকল্পনা (Frequency of use of plan)

(গ) উচ্চক্রমের ভিত্তিতে পরিকল্পনা (Hierarchical Plan)

ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞগণ পরিকল্পনাকে বিভিন্নভাগে ভাগ করেছেন। নিচে পরিকল্পনার প্রকারভেদ দেখানো হলঃ

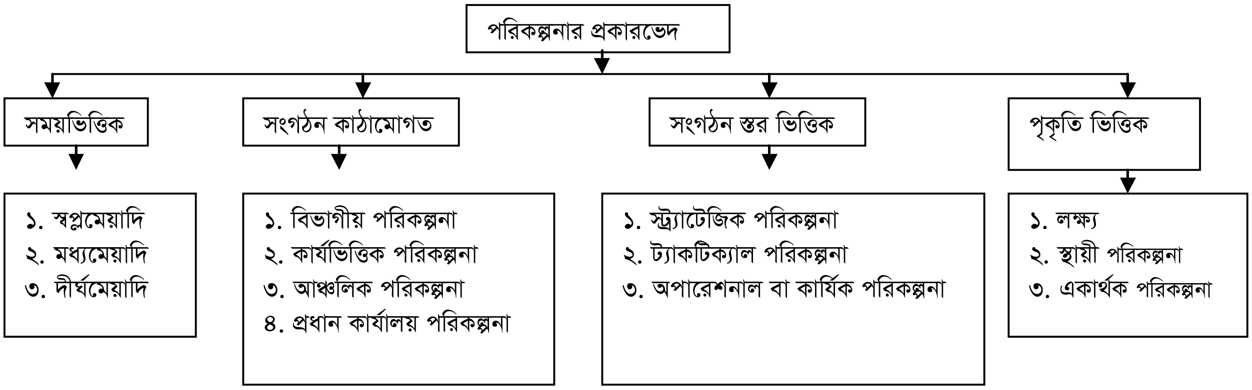

চিত্র ঃ পরিকল্পনার প্রকারভেদ

নিম্নে চিত্রনুযায়ী পরিকল্পনার বিবরণ দেয়া হল ঃ

(ক) সময়ভিত্তিক পরিকল্পনাঃ সময়ের উপর ভিত্তি করে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা বলে। এ সকল পরিকল্পনা হল ঃ

১. স্বপ্লমেয়াদি পরিকল্পনা ঃ যে পরিকল্পনা স্বল্প সময়ের জন্য প্রণয়ন করা হয়, তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। সাধারণত এক বছর বা তার কম সময়ের জন্য গৃহীত পরিকল্পনাকে স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বলে। এটি সাধারণতঃ এক বৎসরের জন্য

প্রণয়ন করা হয়।

২. মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা ঃ যে সমস্ত পরিকল্পনা এক বছরের অধিক সময়ের জন্য প্রণয়ন করা হয়, তাদেরকে মদ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। এগুলো সাধারণত: পাঁচ বছরের জন্য স্থায়ী হতে পারে।

৩. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ঃ সে সমস্ত পরিকল্পনা দীর্ঘ মেয়াদের জন্য প্রণয়ন করা হয়, তাদেরকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। এটি সাধারণত: পাঁচ বছরের অধিক সময়ের জন্য অর্থাৎ দশ বা বিশ বছরের জন্য প্রণয়ন করা হয়ে থকে।

নিচে চিত্রের মাধ্যমে উক্ত তিন ধরনের পরিকল্পনা দেখানো হল ঃ

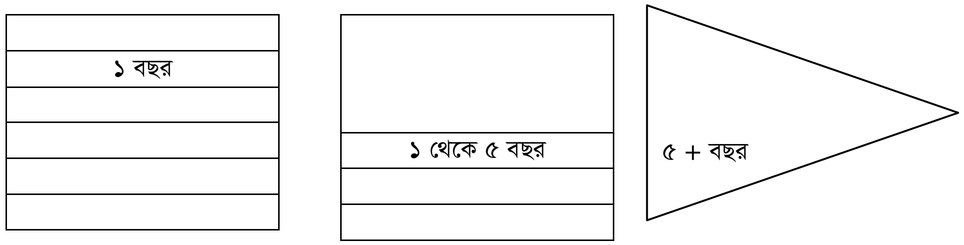

স্বল্পমেয়াদি মধ্যমেয়াদি দীর্ঘমেয়াদি

(খ) উচ্চক্রমভিত্তিক পরিকল্পনা (On the basis of Hierarchy)
উচ্চক্রম অনুসারে একটা প্রতিষ্ঠানে তিনটি প্রধান স্তর থাকে। এগুলো হচ্ছে

(১) উঁচু স্তর (২) মধ্য স্তর এবং (৩) নিম্ন স্তর। এই স্তরগুলোর ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা ব্যবস্থাপকগণ গ্রহণ করেন। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১. কৌশলগত পরিকল্পনা (Strategic plan): এই পরিকল্পনাগুলো সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠানের উঁচু স্তরের সাথে সম্পর্কিত। কৌশলগত পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টি বা কল্পনাকে নির্দিষ্ট করে। একটা প্রতিষ্ঠান কোন ব্যবসায়ে আছে, এবং কি করার চিন্তাভাবনা করছে এবং কিভাবে একটা প্রতিষ্ঠান তার দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবে রূপায়িত করবে তা এই কৌশলগত পরিকল্পনা নির্দিষ্ট করে। আরও ব্যাপকভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, একটা প্রতিষ্ঠান কিভাবে তার কার্য পরিবেশে নিজের অবস্থাকে নির্দিষ্ট করবে তা ঠিক করাই হচ্ছে কৌশলগত পরিকল্পনার কাজ। অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদে প্রতিষ্ঠানটি কী করতে চায় সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করাই হলো কৌশলগত পরিকল্পনা।

২. প্রশাসনিক পরিকল্পনা (Administrative Plan): একটি প্রতিষ্ঠানের সম্পদের উৎসমূহ নির্দেশিত করা এবং প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ উপ-বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য ব্যবস্থাপকগণ প্রশাসনিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। এ জন্যে এ পরিকল্পনাগুলোর জন্য প্রতিষ্ঠানের মধ্য স্তরের ব্যাপক দায়বদ্ধ।

৩. কার্যিক পরিকল্পনা (Operating Plan): প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যক্রমগুলো পরিচালনার জন্য এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যেমন- প্রতিষ্ঠানের নিম্ন স্তরের কার্যাবলী পরিচালনা করার জন্য অনেক কার্যিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

(গ) ব্যবহারের মাত্রার ভিত্তিতে পরিকল্পনা (Frequency of use of plan): পরিকল্পনার শ্রেণীবিভাগের আরও একটি ভিত্তি হচ্ছে ব্যবহারের মাত্রার ভিত্তি। এই ভিত্তিতে পরিকল্পনাকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যা।

যথা- (i) লক্ষ্য(Goal)
(ii)স্থায়ী পরিকল্পনা (Standing plan)
(ii) একার্থক পরিকল্পনা (Single use plan)

(i) স্থায়ী পরিকল্পনা (Standing plan)

যে পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানে একবার গৃহীত হওয়ার পর নতুন কোন অবস্থা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কারবার প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়

তাকে স্থায়ী পরিকল্পনা বলে। Ricky W. Griffinএর মতে,"একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বারে বারে ঘটে এমন কাজের জন্য তৈরীকৃত পরিকল্পনাই হলো স্থায়ী পরিকল্পনা" (Standing plan is developed for activities that regularly over a period of time)সুতরাং বলা যায়, যে পরিকল্পনা একবার ব ্যবহৃত হয়ে পরিত্যক্ত হয় না এবং তাই পরিস্থিতিতে বার বার ব্যবহৃত হয়, তাকে স্থায়ী পরিকল্পনা বলে। এরূপ পরিকল্পনা নিম্নোক্ত কয়েক ধরনের হতে পারে:

১. নীতি (Policy)

নীতি হল একটি সাধারণত বিবৃতি যা কার্য সম্পাদন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। এটা লিখিত বা মৌখিক দুই ধরনেরই হতে পারে। সাধারণতঃ বারংবার (Repetitive) ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিকল্পনা নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। এটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট করে দেয় এবং সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত যাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হয় তা নিশ্চিত করে। এটা সমজাতীয় ক্ষেত্রে বা সমস্যার সময় তাৎক্ষণিক সমাধান প্রদান করতে পারে। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সময় কম নষ্ট হয়। যেমনঃ কোন প্রতিষ্ঠান নগদ বিক্রয়ের নীতি বা জ্যেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে পদোন্নতির নীতি গ্রহণ করলে পণ্য বিক্রি এবং পদোন্নতির জন্য বারবার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় না। নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে নমনীয়তা প্রদর্শন করা যায়।

২. প্রক্রিয়া (Procedure)

নীতি বা উদ্দেশ্যের আলোকে কার্য সম্পাদন করতে যে বিশেষ ক্রম বা প্রণালী অনুসরণ করা হয়, তাকে প্রক্রিয়া (Procedure) বলে। অর্থাৎ একটি বিশেষ কাজ সম্পাদন করতে কি কি পদক্ষেপ, কখন ও কিভাবে গ্রহণ করতে হয়। প্রক্রিয়া তা নির্দেশ করে। নীতির আওতাভুক্ত এলাকার মধ্যেই নির্দিষ্ট পথ ধরে প্রক্রিয়া বিরাজ করে। তবে নীতির ন্যায় প্রক্রিয়া নমনীয় নয়। এখানে স্মরণীয় যে, উচ্চ স্তর হতে নিম্ন স্তরেই প্রক্রিয়া গ্রহণের পরিমাণ বেশী। কারণ সেখানে সাবধানতামূলক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনেক বেশী। উদাহরণস্বরূপ, কোম্পানীর নীতি বাস্তবায়ন করার জন্য যে প্রক্রিয়া স্থির করা হয়েছে, তা দ্বারা কে কখন ছুটি পাবে, ছুটিকালীন বেতন বা মজুরীর হার কি হবে ইত্যাদি নির্ধারিত হয়।

৩. বিধি (Rule)

প্রতিষ্ঠানের ভেতর কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কি করতে হবে বা না হবে সে সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তকেই বিধি বলা হয়। এটা সবচেয়ে সহজ ধরনের পরিকল্পনা। প্রক্রিয়া ও বিধির মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও এদের মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে প্রক্রিয়াতে সময়ের উল্লেখ থাকে আর বিধির মধ্যে তেমন কোন সময় সীমার উল্লেখ থাকে না। অপরদিকে নীতি ও বিধির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিচার বিবেচনা করতে হয়, অপরদিকে বিধি প্রয়োগে কোন প্রকার বিচার বিবেচনার সুযোগ নেই।

Whirich & Koontz-এর মতে, "প্রক্রিয়া হলো একটি পরিকল্পনা যা ভবিষ্যত কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনীয় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করে। এগুলো কার্যক্রমের ধারাবাহিক পর্যায়। (Procedures are plans that establish a required method of handling future activities. They are chronological sequence") সুতরাং বলা যায়, প্রক্রিয়া হলো কোনো নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ভীতি-নীতি যা অনুসরনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদন করতে হয়।

Martol & Martin-এর মতে, "বিধি বারতি একটি বিবৃতি যা বলে দেয় যে, কোন পরিস্থিতিতে কোন কাজটি করতে হবে, আর কোনটি করতে হবে না। (Rule is a statement that spills out a speciafication to be taken or not taken in agivense tution)

(ii) একবার ব্যবহার্য পরিকল্পনা (Single-use-plan)

যে পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত না হয় শুধুমাত্র একবার ব্যবহারের জন্য বা একটিমাত্র উদ্দেশ্য সাধনেরজন্য প্রণয়ন করা হয় তাকে একবার ব্যবহার্য পরিকল্পনা বলে। এ পরিকল্পনাসমূহ একক পরিস্থিতি বা সমস্যার ক্ষেত্রে প্রণয়ন করা হয় এবং সাধারণত একবার ব্যবহারের পর এটাকে পরিবর্তন করা হয়। Stover ও সহযোগীদের মতে, এককালীন পরিকল্পনা হলো কোন বিষয়ে বিশদ কার্যক্রম যা ভবিষ্যতে একই আকারে পুনর্বার ব্যবহৃত হবার সুযোগ নেই।

ব্যবস্থাপকরা সাধারণত তিন ধরনের একার্থক পরিকল্পনা ব্যবহার করেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলঃ

১. **প্রধান কর্মসূচী (Major Program):** কর্মসূচী হল সেই সব একবার ব্যবহার্য পরিকল্পনা যা বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনার সংমিশ্রণে গঠিত একটি সঠিক কার্যক্রম। এতে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনাকে নীতি ও কার্যপ্রণালীর আকারে এমনভাবে একত্রিত করা হয় যাতে প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য এরা কার্যকর হতে পারে। সংক্ষেপে কর্মসূচী হচ্ছে লক্ষ্য, নীতি, বিধি ইত্যাদির বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয়ত অন্যান্য উপাদানসমূহ নিয়ে গঠিত একটি সামগ্রিক কার্যক্রম।W.H. Newman-এর মতে, একটি প্রধান কর্মসূচি উদ্দেশ্যার্জনের জন্য সম্ভাব্য সময়সহ প্রধান প্রধান পদক্ষেপসমূহ দেখায়, যা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।"

প্রোগ্রাম বা কর্মসূচী আবার মৌলিক ও গৌন এ দুই ধরনের হতে পারে। যেমনঃ একটি পরিবহন সংস্থার মৌলিক প্রোগ্রাম হল ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০টি নতুন বিলাসবহুল যাত্রীবাহী বাস ক্রয় করা। এর জন্য ড্রাইভার, সুপারভাইজার নিয়োগ ও এদের প্রশিক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা, সময়সূচীর পুনঃবিন্যাস ইত্যাদি যাবতীয় গৃহীত কর্মসূচীই হচ্ছে গৌণ কর্মসূচী।

২. **প্রকল্প খণ্ড পরিকল্পনা বা প্রজেক্ট (Project):** প্রোগ্রাম বা কর্মসূচীর মত প্রজেক্ট এরও একই বৈশিস্ট রয়েছে কিন্তু এরা সাধারণতঃ কার্যক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ এবং কম জটিল। সাধারনতঃ কমৃসূচীকে সাপোর্ট দেয়ার জন্য প্রজেক্ট তৈরী করা হয়।

প্রজেক্ট হচ্ছে একবার ব্যবহার্য একটি কার্যক্রম, যেখানে কতিপয় উদ্দেশ্যাবলী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে। এর সম্ভাব্য খরচ পূর্ব নির্ধারিত থাকে। অর্থাৎ প্রধান কর্মসূচির অধীনে প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য পথক পৃথক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ পৃথক পরিকল্পনাই হলো প্রকল্প বা খণ্ড পরিকল্পনা বা প্রজেক্ট।

৩. **বাজেট (Budget):** পরিকল্পনাকে যখন সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা হয় তখন তাকে বাজেট বলে। একে সংখ্যায়িত কর্মসূচীও বলা হয়। প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীকে শ্রম-ঘন্টা, উৎপাদন একক, টাকা ইত্যাদি সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। এটা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমনঃ নগদান বাজেট, ক্রয় বাজেট, মূলধনী বাজেট, ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর সংখ্যায়িত রূপ সম্পর্কে পুর্বানুমান করা হয়। বাজেট অন্যান্য পরিকল্পনাকে সুনির্দিষ্ট এবং বাস্তবমুখী করতে সহায়তা করে।

প্রত্যেকটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে উপরোক্ত বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপসমূহ

Steps of Planning

ভবিষ্যতে একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য কি কি কাজ করতে হবে, কিভাবে, কোথায়, কখন এবং কত সময়ে এই কাজ শেষ করতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি প্রক্রিয়াই হচ্ছে পরিকল্পনা। প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য অনেকাংশেই পরিকল্পনার সাফলতার উপর নির্ভরশীল। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজেই সাফলতা আসে না। কি ব্যক্তি জীবনে, কি সমাজ জীবনে, কি ব্যবসায়, কি রাষ্ট্রীয় কাজে সর্বক্ষেত্রেই পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবস্থাপক ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে। নিচে পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করা হলোঃ

১. **সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সতর্কতা (Being awar of opportunity):** এটা পরিকল্পনা প্রণয়নের সর্ব প্রথম পদক্ষেপ। যদিও এটা মূল পরিকল্পনার পূর্বেই চিন্তা করতে হয়। ভবিষ্যতে পরিকল্পনা হতে কি কি সুবিধা পাওয়া যাবে, বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের শক্তি ও দুর্বলতাসমূহ এবং অন্যান্য সমস্যাদি সম্পর্কে সচেতন হওয়া। এ স্তরটি প্রধানতঃ মনস্তাত্বিক।

২. **উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নির্ধারন (Setting objectives or goals):** পরিকল্পনার পরবর্তী পদক্ষেপ হল প্রতিষ্ঠানের জন্য মুখ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা এবং এই মুখ্য বা মৌলিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য সহায়ক উদ্দেশ্যাবলী প্রতিষ্ঠা করা। এখানে অবশ্যই লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত উদ্দেশ্য অবশ্যই বাস্তবাধর্মী, আদর্শ ভিত্তিক ও স্পষ্ট হতে হবে। উদ্দেশ্যবালী অর্জনে সহায়ক যাবতীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. **পরিকল্পনা পটভূমি বিবেচনা করা (Considering planning premises):** পরিকল্পনা আঙ্গিনা বলতে ভবিষ্যতের প্রত্যাশিত পরিস্থিতি সম্বন্ধীয় অনুমানকেই বুঝায়। পরিকল্পনা সংক্রান্ত যাবতীয় উপাদানের মধ্যে কতগুলো স্থির প্রকৃতির

আর কতগুলো পরিবর্তনশীল। স্থির প্রকৃতির উপাদানসমূহ অনমনীয় থাকে বলে এদের তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অপরদিকে পরিকল্পনের পটভূমিতে জনসংখ্যার গতি, উৎপাদন ব্যয়, সরকারী নিয়ন্ত্রণ, মূলধনও কাঁচামালের সহজ প্রাপ্যতা, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ইত্যাদি পরিবর্তনশীল উপাদান সমূহের পূর্বানুমানে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়।

৪.তথ্য সংগ্রহ (Collection of data): পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ হলো সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা।

৫.বিশ্লেষণ (Analysis of data): এ স্তরে এসে সংগৃহিত তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করা হয়।

৬. বিকল্প কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ (Indentifying alternatives): এই পদক্ষেপে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাম্ভাব্য বিভিন্ন বিকল্প কার্য পদ্ধতিসমূহ অনুসন্ধান, গবেষণা, চিন্তা-ভাবনা করে এদের মধ্যে শক্তিশালী ও দুর্বল বিকল্পগুলো সনাক্ত করতে হয়। Koontz এর মতে, বস্তুত এমন কোন পরিকল্পনা নেই যার জন্য উপযুক্ত বিকল্পসমূহ বিদ্যমান থাকে না।

৭. বিকল্প কর্মপস্থাসমূহের মূল্যায়ন (Comparing alternative courses of action): বিকল্প কর্মপন্থাগুলির দুর্বল ও সবল দিক নির্ধারণের পর একটি প্রতিষ্ঠানের পূর্বে নির্ধারিত উদ্দেশ্যও ভবিষ্যত পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় প্রত্যেক বিকল্প বিশেষভাবে মূল্যায়ন করতে হয়। সাধারণতঃ মূল্যায়ন দুটি পদ্ধতিতে করা হয়। যথা, গুণগত ও সংখ্যাগত বিশ্লেষণ।

৮. সর্বোত্তম কর্মপন্থা নির্ধারণ (Choosing the best alternative): এই পদক্ষেপ প্রত্যেকটি বিকল্প যথাযথ ভাবে মূল্যায়িত হবার পর বিচক্ষণতা, নৈপুন্য ও প্রয়োজনবোধে সহকর্মীদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে সর্বোত্তমটি বেছে নিতে হয়। এই পদ্ধতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বা পছন্দ করা বিকল্পই হচ্ছে চূড়ান্ত পরিকল্পনা।

৯. সহায়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন (Formulating supporting plans): মুখ্য পরিকল্পনা সহজ ও সুন্দর ভাবে বাস্তবায়নের সুবিার্থে কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহায়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। এর ফলে মুখ্য পরিকল্পনা সফলতা লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কয়েকটি সহায়ক পরিকল্পনা (যেমন- কর্মী নিয়োগ যন্ত্রপাতি ক্রয়, মূলধন সংগ্রহ, জমি সংগ্রহ, ইত্যাদির পরিকল্পনা) গ্রহণ করতে হয়।

১০. বাজেট করণ (Budgeting): পরিকল্পনার সংখ্যাত্মক প্রকাশই হলো বাজেট। যেহেতু পরিকল্পনার জনশক্তি ও অন্যান্য উপকরণাদির খরচপত্র অন্তর্ভুক্ত থাকে তাই অর্থসংস্থানের উৎস ও ব্যয়ের খাতগুলি ও নির্ধারণ করা দরকার। বাজেটের উপর কর্মসূচীর আকৃতি নির্ভর করে। এটা বিভিন্ন বিভাগীয় হতে পারে। বাজেট আর্থিক এবং অনার্থিক এ দুই ধরনের হতে পারে। যেমনঃ কোন একট বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য ৪০,০০০ টাকার প্রয়োজন। এটা আর্থিক বাজেট। আর এই অনুষ্ঠানের জন্য ২০০টি চেয়ার, ২০টি টেবিল, ১০০টি মুরগী, ১ মন চাল ইত্যাদি প্রয়োজন। এটা হচ্ছে অনার্থিক বাজেটের উদাহরণ।

১১. কার্যারম্ভের সময় ও কার্যক্রম নির্ধারণ (Determining time of program of commencement): এ স্তরে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরুর সময় ও বিভিন্ন কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়।

১২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন (Implementation of plan): উপরোক্ত সব পদক্ষেপ সফলভাবে সম্পন্ন হলে এ স্তরে এটা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হয়।

১৩. পরিকল্পনায় সম্পাদিত কার্যাবলি মূল্যায়ন ও সংশোধনমুলক ব্যবস্থাগ্রহণ (Evaluation of performance & taking corrective Action):

১৪. বিশেষ কর্মসূচি (Special assignment) ঃ এ পরিকল্পনায় কোন নির্দিষ্ট সময় বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা থাকে না। প্রধান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হঠাৎ কোন সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং কর্য-সম্পাদনে বিঘ্ন ঘটতে পারে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তা-ই বিশেষ কর্মসূচি। অর্থাৎ, কোন চলমান কাজে সমস্যা দেখা দিলে এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত সমস্যা সমাধান হয়ে গেলে এর সমাপ্তি ঘটে। সুতরাং আকস্মিকভাবে উদ্ভুত কোন পরিস্থিতি মোকাবিলা বা সমস্যা সমাধানের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, তাকে বিশেষ কর্মসূচি বলে।

১৫. বিশদ পরিকল্পনা (Detailed plan) ঃ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং এদের জন্য যে, পরিকল্পনা গ্রহণয়ন করা হয়, তাদেরকে একত্রে বিশদ পরিকল্পনা বলে। এক্ষেত্রে প্রতিটি পরিকল্পনার খুঁটি-নাটি বিশ্লেষণপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ-বলা যায়, কোন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের মৌলিক পরিকল্পনা থাকে। বিক্রয় পরিকল্পনা তাদের মধ্যে একটি। সুতরাং বিক্রয় পরিকল্পনাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য এর খুটি-নাটি সব বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয় এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এদেরকে বিশদ পরিকল্পনা বলা হয়।

নিম্নের চিত্রে পরিকল্পনার পদক্ষেপসমূহ প্রদর্শিত হলো-

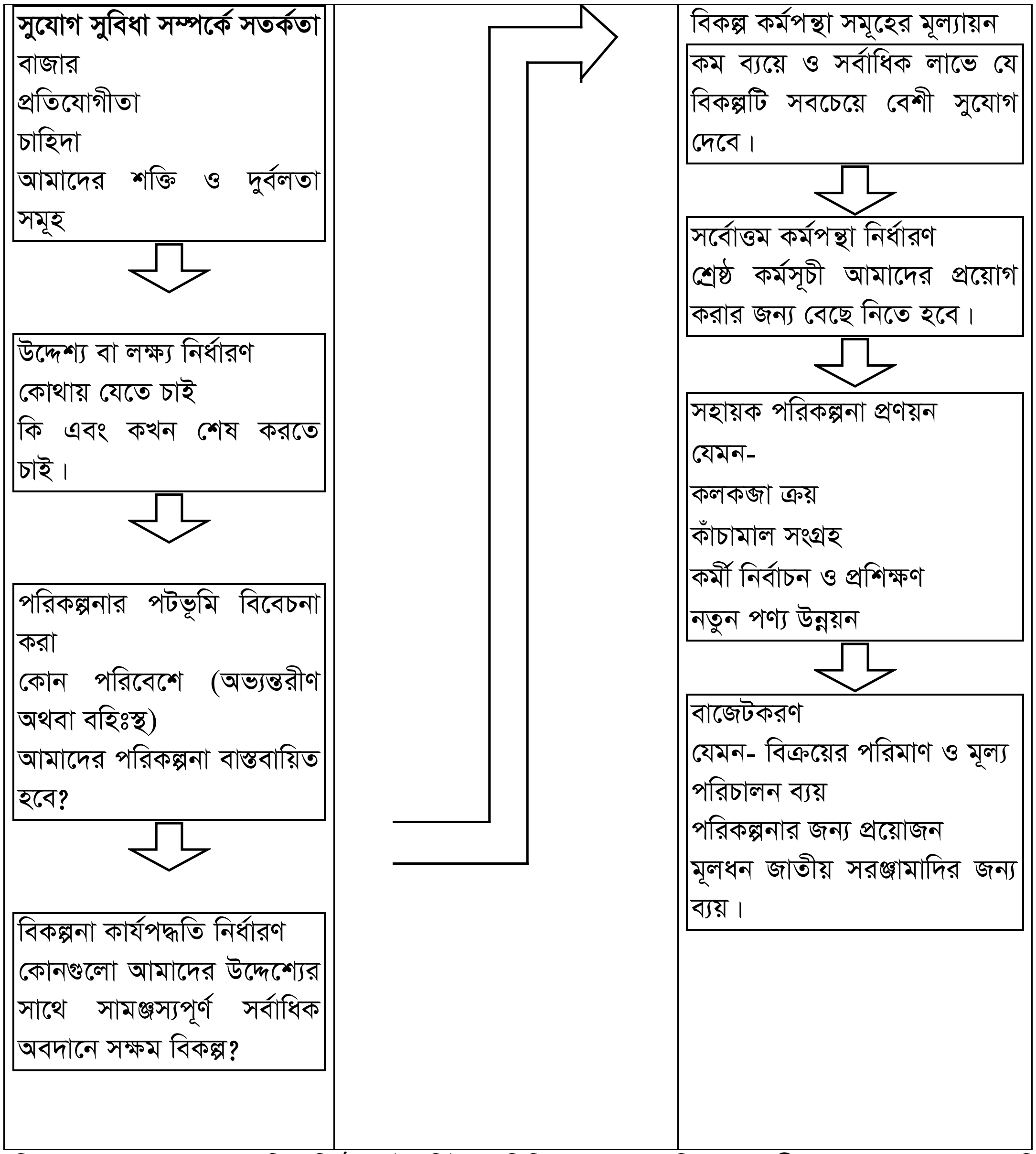

পরিশেষে বলা যায় যে, একটি প্রতিষ্ঠানে উপরিউক্ত, বিভিন্ন ধারনের পরিকল্পনা গৃহীত হতে পারে। তবে প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরন ও প্রকৃতীনুযায়ী সময় ও কাজের উপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, যা উদ্দেশ্যর্জানের সহায়ক।

উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Effective Planning

পরিকল্পনার উপর নির্ভর করেই ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজ সম্পাদিত হয়। তাই পরিকল্পনা ভাল না হলে অন্যান্য কাজ হতেও প্রত্যাশিত সাফল্য আশা করা যায় না। একটি আদর্শ পরিকল্পনার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকা উচিতঃ

১. **নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (Clear objective)**: সঠিক পরিকল্পনার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকতে হবে। কারণ উদ্দেশ্য স্থির ও নির্দিষ্ট না থাকলে পরিকল্পনার কার্যাবলী সঠিকভাবে সম্পাদিত হতে পারে না। তাই আদর্শ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে গেলে প্রথমে উদ্দেশ্য স্থির করতে হয়। তারপর ঐ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উপযুক্ত ধারাবাহিক কর্মপন্থা স্থির করতে হয়।

২. **ঐক্য (Unity)**: প্রতিষ্ঠানের একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন খন্ড খন্ড পরিকল্পনা থাকতে পারে। এই সকল খন্ড খন্ড পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক পরিকল্পনা সফলতা নির্ভর করে। তাই এই সকল পরিকল্পনার ভেতর সঠিক সমঝোতা এবং পরস্পর সম্পর্ক ও ঐক্য থাকতে হবে।

৩. **সহজবোধ্যতা (Easy to understand)**: পরিকল্পনা যথাসম্ভব সহজাবোধ্য ও সহজসাধ্য হওয়া উচিত। কারণ পরিকল্পনা সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করা হলে তা বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিটি কর্মী এটা অনুধাবনের সক্ষম হবে। অন্যথায় পরিকল্পনা নির্বাহীদের নিকট বোধগম্য না হলে এর কার্যকারিতা হ্রাস পায়।

৪. **নিরবচ্ছিন্নতা(Continuity)**: পরিকল্পনার অনুপস্থিতি ব্যবস্থাপনার অপরাপর সকল কার্য প্রক্রিয়ায় জটিলতার সৃষ্টি করে। তাই পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণীত হওয়া উচিত যাতে কখনই তার অনুপস্থিতি না ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, একটা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের জন্য ১ মাসের যাবতীয় পরিকল্পনা নেয়া আছে। এখন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সচল রাখার জন্য পূর্ব মাসের পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পূর্বেই নতুন মাসের পরিকল্পনা তৈরী ও প্রস্তুত রাখতে হবে।

৫. **সাংগঠনিক সম্পর্কের প্রতিফলন (Reflection of organisational relation)**: উত্তম পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ ও উপ-বিভাগের সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটা উচিত। পরিকল্পনার কোন দিক কোন বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন হবে তা পরিকল্পনায় বর্ণিত না থাকলে এর বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৬. **নির্ভুলতা (Accuracy)**: পরিকল্পনা যতদুর সম্ভব নির্ভর হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর এর জন্য সঠিক সময়ে সঠিক পূর্বানুমান অপরিহার্য। পরিকল্পনা নির্ভুল না হলে প্রতিষ্ঠানের অর্থ, শ্রম ও সম্পদের অপচয় বৃদ্ধি পায়। এজন্য অতীত অভিজ্ঞতা পরিস্থিতি এবং তথ্যাবলির বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে পরিকল্পনা নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৭. **নমনীয়তা (Flexibility)**: নমনীয়তা আদর্শ পরিকল্পনার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। পরিকল্পনা পটভূমির পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনায় নমনীয়তার ব্যবস্থা রাখা দরকার। কারণ নমনীয়তার ব্যবস্থা না থাকলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয় না।

৮. **তথ্য নির্ভরশীলতা (Based on information)**: একটি উত্তম পরিকল্পনা অবশ্যয়ই তথ্য ও অভিজ্ঞতা নির্ভর হওয়া উচিত। অবাস্তব ধারণা বা খেয়ালীর উপর নির্ভর করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে তা বাস্তবে সুফল প্রদান করতে পারে না। যে তথ্যের উপর নির্ভর করা হবে তা যথার্থ কিনা তাও বিবেচনা করা উচিত।

৯. **সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার (Proper use of resources)**: পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করা উচিত যাতে প্রতিষ্ঠানের যে সব সম্পদ ও সুযোগে সুবিধা আছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়। পরিকল্পনা এমন হওয়া উচিত নয় যাতে সম্পদের অপচয় হয়।

১০. **বাস্তবমুখী পরিকল্পনা (Realistic plan)**: পরিকল্পনা সর্বদা বাস্তবমুখী হতে হবে। পরিকল্পনার মধ্যে বাস্তবমুখী উদ্দেশ্য থাকতে হবে এবং এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বাস্তবমুখী কর্মসূচী থাকতে হবে।

১১. **উপায় সমূহের পূর্ণ সদ্ব্যবহার (Proper utilisation of means)**: একটি আদর্শ পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সকল উপায় সমূহের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের নিশ্চয়তা থাকা উচিত। পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতার কারণে যদি উপায়সমূহ অব্যবহৃত থাকে তবে ফলাফলের বিবেচনায় তা নেতিবাচক হতে বাধ্য।

১২. গ্রহণযোগ্যতা (Acceptability): উত্তম পরিকল্পনা অবশ্যয়ই প্রতিষ্ঠানের সর্বশ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক সাদরে গৃহীত হবে। সাধারণতঃ পরিকল্পনার কাজ প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্তর থেকে শুরু করা হয়। তবে এর সঙ্গে অর্ধস্তত্বেরর কর্মচারীদের সম্পৃক্ত করা হলে পরিকল্পনার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, একটি আদর্শ ও উত্তম পরিকল্পনাকে অবশ্যয়ই উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ হতে হবে। অন্যথায় এটা শুধু কল্পনাই থেকে যাবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রকারভেদ, পরিকল্পনার পদক্ষেপসমূহ, উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য সমূহ প্রভাব বোঝানোর জন্য একটি ধারণাচিত্র অংকন করুন।

সারসংক্ষেপ:

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে কোন্ কাজ কখন, কার দ্বারা, কিভাবে সম্পাদিত হবে এ সম্পর্কে পূর্বঅভিজ্ঞতা ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত কার্যসূচি প্রণয়নের প্রক্রিয়াই হলো পরিকল্পনা। পরিকল্পনা একটি গতিশীল, যুক্তিগ্রাহ্য, মানসিক এবং বুদ্ধিদীপ্ত একটি প্রক্রিয়া যা কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য স্থির এবং ঐ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে করণীয় সবচেয়ে সম্ভাব্য উপযুক্ত কর্মসূচী প্রণয়ন করে।
ভবিষ্যতে একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য কি কি কাজ করতে হবে, কিভাবে, কোথায়, কখন এবং কত সময়ে এই কাজ শেষ করতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি প্রক্রিয়াই হচ্ছে পরিকল্পনা। প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য অনেকাংশেই পরিকল্পনার সাফলতার উপর নির্ভরশীল। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজেই সাফলতা আসে না। কি ব্যক্তি জীবনে, কি সমাজ জীবনে, কি ব্যবসায়, কি রাষ্ট্রীয় কাজে সর্বক্ষেত্রেই পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবস্থাপক ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে।

পাঠ-৪.৩ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য, নীতি, কৌশল ও লজিষ্টিক্স; কৌশল ও নীতির উৎসসমূহ, কৌশল ও নীতির মৌলিক প্রকারভেদ

Goals, Policy, Strategy in Management, Sources and Basic Types of Policy and Strategy

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য,নীতি, কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনা কৌশল ও নীতির উৎসসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কৌশল ও নীতির মৌলিক প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য, নীতি, কৌশল

Goals, Policy, Strategy in Management

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কতটুকু অর্জন সম্ভব তা নির্ভর করে মূলত নীতি, কৌশল এবং লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনার উপর। নীতি, কৌশল ও লজিস্টিক্স পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যদি এদের একটি উপাদানেরও ঘাটতি হয়- তাহলেও পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। একটি কারবার প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কৌশল ও নীতি রয়েছে। সংগঠনের ধরন ও পরিস্থিতি বুঝে এদের উন্নয়ন এবং প্রয়োগ করতে হয়। একটি কারবারের বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন- পণ্য ও সেবা, বিপণন, অর্থসংক্রান্ত ইত্যাদি। বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন কৌশল ও নীতির সুষ্ঠু উন্নয়ন ও প্রয়োগ করতে হয়। সর্বোপরি পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে, সঠিক সম্পদ সরবরাহ অথবা লজিস্টিক্সের ব্যবস্থা করতে হয়।

লক্ষ্য (Goals)

যে পরিকল্পনা ইপ্সিত বা অভিপ্রাত ফল অর্জনের জন্য প্রণীত হয়, তাকে লক্ষ বা goal বলে । অভিপ্রেত ফল অর্জনের মাধ্যমে হিসেবে লক্ষ্য রচনা করা হয়। যেমন: উৎপাদন ব্যবস্থাপকের কোন নির্ধারিত সময়ে ১০% উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনাকে লক্ষ্য বলা হয়।

W.H. Newman- এর মতে, পরিকল্পনাকে যখন ফলাফল প্রকাশ করা হয়, যা অর্জন করতে হবে, তাকে লক্ষ্য বলে। (Plan expressed as result to be achived may be called goals.)

Bartol & Maritin - এর মতে, লক্ষ্য হল প্রপ্ত ফলাফল, য়া প্রতিষ্ঠান অর্জন করতে চায়| (A goal is end result that an organization wishes to achive).

সুতরাং বলা যায় যে, লক্ষ হল এমন একটি প্রয়াস যা প্রতিষ্ঠানের কাঙ্খিত ফল অর্জনের জন্য পরিচালিত হয়। লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই প্রতিষ্ঠানের সমগ্র কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এটিকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

(ক) উদ্দেশ্য ঃ উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন এক বিন্দু যাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ের সমুদয় পরিকল্পনা রচিত হয় ও সমুদয় কার্যাদি পরিচালিত হয়, যা প্রতিষ্ঠান প্রত্যাশা করে। তাই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুবর্ণিত উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক।

উদ্দেশ্য সুবর্ণিত থাকলে ভবিষ্যতে কর্ম ধারা তৈরি করা সহজ হয়। এটি একটি মৌলিক পরিকল্পনা যা কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির প্রান্ত সীমা নির্দেশ করে। মূল উদ্দেশ্যের আলোকে প্রতিটি বিভাগ, উপ-বিভাগেও উদ্দেশ্য নির্ধারিত হতে পারে।

(খ) বাজেটঃ ভবিষ্যত কার্যাবলির সম্ভাব্য ফলওলোকে যখন অংকে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে বাজেট বরে। যেমনঃ কোন দেশের বাজেট, কোন প্রতিষ্ঠানের বাজেট। ভবিষ্যতে কোন্ কোন্ খাতে আয় ও ব্যয় হবে তা বাজেটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এতে কাজের চেয়ে কাজের ফলাফলের বিশদ বিবরণ দেয়া থাকে।

(গ) সময় সীমা ঃ কার্যাবলি কখন শুরু করে যখন শেষ করেতে হবে, তা যে পরিকল্পনায় বলা থাকে, তাকে সময়সীমা বলে। পরিল্পনায় বিভিন্ন কাজের বিবরণ দেয়া হয়। এ কাজগদুলো কখন শুরু করে কখন শেষ করতে হবে তা নির্ধারন করা প্রয়োজন। এ পরিল্পনার মাধ্যমে প্রতিটি কাজের শুরু ও শেষ হবার সময়-সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

(ঘ) কার্য- লক্ষ্য ঃ এ পরিকল্পনায় বিভিন্ন কাজের মান নির্ধারণ করা হয়। এ পর্যায়ে কোন কার্যের ফল কত হবে তা নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতিটি কার্য পরিকল্পনা লক্ষ অর্জনে সচেষ্ট হয়। Bartol & Maritin - এর মতে, কার্য লক্ষ্য হল অভীষ্ট লক্ষ্য বা ভবিষ্যত প্রাপ্ত ফলাফল যা নিচের স্তরের ব্যবস্থাপনা কর্তৃক নির্ধারিত হয় যা নিচের স্তর হতে সুনির্দিষ্ট পরিমাপযোগ্য ফলাফল প্রত্যাশা কলে।

(ঙ) স্ট্রাটেজিক লক্ষ্য ঃ এটি সাধারণত উচ্চ ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রণীত হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক বিষয় তুলে ধরা হয়। এটিকে দাপ্তরিক লক্ষ্যও বলা হয়। কারণ এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উচ্চ ব্যবস্থাপনার কর্তৃক উল্লেখিত হয়। সুতরাং উচ্চ ব্যবস্থাপনা কর্তৃক অভীষ্ট ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যকে স্ট্রাটেজিক লক্ষ্য বলে।

(চ) ট্যাক্টিক্যাল লক্ষ্যঃ এটি এমন একটি লক্ষ্য যা মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কর্তৃক নির্দিষ্ট বিভাগ বা ইউনিটের জন্য প্রণীত হয়। এ লক্ষ্যে উল্লেখ করা হয় যে স্ট্রাটেজিক লক্ষ্যে বর্ণিত ফলাফল অর্জনের জন্য বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক কি কি অবশ্যই করা উচিত। এতে উল্লেখিত লক্ষ্য পরিমাপযোগ্র হয়।

নীতি (Policy)

নীতি হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নির্দেশনার একটি বিবরণ। অর্থাৎ নীতি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের চিন্তা-ভাবনাকে পরিচালিত করে। যেমন- কর্মচারীদের চাকুরীর শুরুতেই এক বছর শিক্ষানবীস থাকতে হবে- এটা হলো একটি নীতি। প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য একটি সাধারণ হল নীতি। এটি উচ্চ ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রণীত হয়। এটি কার্য-সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের পথ-নির্দেশ করে।

অধ্যাপক নিউম্যান বলেন, ‘পলিসি বা নীতি হচ্ছে কার্যের একটি সাধারণ পরিকল্পনা যা কার্য সম্পাদনে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদেরকে পথ-নির্দেশ দেয়।’ (Policy is a general plan of action that guides members of the enterprise in the conduct of its operation)

Newman Sumner and Warren- এর মতে, পলিসি হতে পরে-
(ক) সুনির্দিষ্ট ও প্রকৃতিগতভাবে বড় ;
(খ) সমস্যা বা পরিস্থিতি একটি বা অনেক দিক নিয়ে কাজ করে,
(গ) বড় বা ছোট সীমা নির্দেশ করে যার মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে ;
(ঘ) সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদক্ষেপ সুনির্দিষ্ট করে দেয়া।

Samuel C. Certo. এর মতে, পলিসি হল একটি স্থায়ী পরিকল্পনা যা সাংগঠনিক উদ্দেশ্যর্জনের সাথে মিল রেখে কার্যক্রম গ্রহণে ব্যবস্থাপনাকে পথ নির্দেশনা দেয়া।’ (A Policy is a standing plan that furnishes broad guidelines for channeling management toward taking action consistent with reaching organizational objectives.)

Rartol & Martin এর মতে, ‘পলিসি হল একটি সাধারণ নির্দেশনা যা বৃহৎ সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়, যার মধ্যে থেকে প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা সাংগঠনিক উদ্দেশ্যার্জনের জন্য কাজ করতে পারবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।Õ (A Policy is a general guide that specifices the broad parameters within which organization members are expected t operate in pursuit of organizational goals.)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে নীতির কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যেমনঃ
(ক) নীতি একটি সাধারণ দিক নির্দেশনা ;
(খ) এটি কর্মীদের কার্য সীমা নির্দেশ করে ;
(গ) একটিকে অনুসরণ করে কার্য-সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেয়া যায় ;
(ঘ) উচ্চ ব্যবস্থাপনা এর বাইরে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না ;
(ঙ) এটি স্থায়ী প্রকৃতির,

সুতারাং বলা যায় যে, নীতি হলো একটি বৃহৎ দিক নির্দেশনা যার অভ্যন্তরে থেকে সাংগঠনিক উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় যাতে কর্মীরা সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে।

কৌশল (Strategy)

কৌশল হলে ভবিষ্যত কার্যাবলীর একটি সাধারণ কর্মসূচী এবং সংগঠনের সার্বিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ ও প্রচেষ্টার প্রয়োগ ও ব্যবহার। অর্থাৎ উদ্দেশ্যে পৌছানোর জন্য সঠিক পথই হলো কৌশল। যেমন, বিক্রয় বাড়ানোর জন্য বিক্রয় কর্মীদের একটি নির্দিষ্ট হারে কমিশন প্রদান একটি কৌশল।

পারস্পরিক সম্পর্ক (Mutual relationship)

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যবস্থাপনা শিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশে যোগ্য ব্যবস্থাপক তৈরি করবে। এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত নিল- একটি প্রোগাম চালু করে দেশের অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং ব্যবস্থাপকদের মাধ্যমে শিক্ষাদান করবে। পাঠ্যসূচিতে এ বিষয়ে সর্বশেষ এবং নতুন বিষয়গুলো সংযোজন করবে। সম্পূর্ণ বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়-

যোগ্য ব্যবস্থাপক তৈরি করার জন্য ব্যবস্থাপনা শিক্ষা কর্মসূচি চালু করার সিদ্ধান্ত একটি নীতি। অর্থাৎ এখানে একটি দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা শিক্ষাদান এবং নতুন বিষয়ের সংযোজন হলো কৌশল। অর্থাৎ লক্ষ্য অর্জনের একটি সাধারণ কর্মসূচী।

কৌশল ও নীতির উৎসসমূহ

Sources of Policy and Strategy

কৌশর ও নীতির উৎসসমূহ হলো-

১. উত্থিত (Originated)
২. আবেদন জনিত (Appealed)
৩. অনুক্ত (Implied)
৪. বাহ্যিক আরোপিত (Externally imposed)

১. উত্থিত (Originated) ঃ সংগঠনের কৌশল ও নীতির উৎস হলো উচ্চ ব্যবস্থাপনা। এক্ষেত্রে উচ্চ ব্যবস্থাপকেরা সংগঠনের উদ্দেশ্য ফলপ্রসুভাবে অর্জনের জন্য অধিনস্তদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। ফলে কর্মচারীরা তাদের নিয়মিত দৈনন্দিন কার্যাবলি ঠিকভাবে করতে পারে। ধরুন আপনি একজন উৎপাদন ব্যবস্থাপক। আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, প্রতিদিন ১০০০ ইউনিট পণ্য উৎপাদন করবেন। আপনি গুদাম রক্ষককে নির্দেশ দিয়ে দিলেন যে ১০০০ ইউনিট উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রতিদিন যেন কারখানার ফোরম্যানকে দিয়ে দেয়া হয়। কারণ বিষয়টি নিত্যদিনের নিয়মিত কাজ হিসাবে বিবেচিত হবে। প্রতিদিনই যদি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে হয় তাহলে উৎপাদন ব্যহত হতে পারে। এ ধরনের সিদ্ধান্তটি হলো উত্থিত। এটা অনেকটা উচ্চ হতে নিম্নমুখী ধরনের। এখানে সিদ্ধান্ত উপর হতে নিচে চাপিয়ে দেয়া হয়ে থাকে। বিষয়টি চিত্র দিয়ে বোঝান যায়-

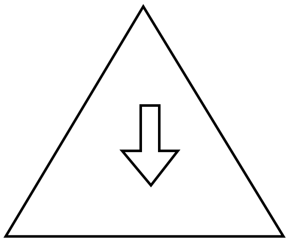

২. আবেদন জনিত (Appealed)ঃ অনেক সময় কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কী সিদ্ধান্ত নিতে হবে অথবা একজন অধস্তন কর্মকর্তার কি সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আছে- তা নিয়ে দোটানায় পড়তে হয়। এ সব পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত দেবার জন্য উচ্চ পদস্থলের কাছে আবেদন জানানো হয় এবং উপর থেকে সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়। এটিই প্রথা এবং এটি ভবিষ্যত নির্দেশনা হিসাবে কাজ করে। তাই এসব পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে সিদ্ধান্ত দিতে হয়। অন্যথায়, ভবিষ্যত কার্যাবলীতে বিপরীত প্রভাব ফেলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মনে করুন আপনি একজন ফোরম্যান। কারখানায় একজন শ্রমিক এক সপ্তাহ ধরে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত। এ অবস্থায়, আপনি কী তাকে বহিষ্কার করবেন, না বেতন কেটে দেবেন তা জানার জন্য কী ব্যবস্থাপককে আবেদন জানাবেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে কর্মী ব্যবস্থাপক যে সিদ্ধান্তটি দেন তা-ই হলো আবেদনজনিত নীতি প্রণয়ন। চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি দেখানো হলো-

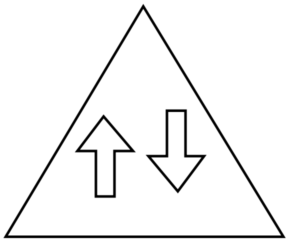

৩. অনুক্ত (Implied)ঃ কিছু নীতি বা কৌশল আচরণের দ্বারা সৃষ্টি হয়। যে সব নীতি লিখিত থাকে তা সব কর্মচারীরাই জানে এবং সেভাবে কাজকরে। কিন্তু সমস্যা হল অলিখিত নীতির ক্ষেত্রে। তখন কোন পরিস্থিতিতে কী করতে হবে তা আচরণের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। যেমন ধরুন, আপনি যখন কোন স্বর্গের দোকানে অথবা অভিজাত কোন কাপড়ের দোকানে কেনাকাটা করতে যান তখন তারা আপনাকে কিছু আপ্যায়ণ করবে যা কোথাও লিখিত নেই। এটা অভিজাত দোকানগুলোর একটি অনুক্ত নীতি বা কৌশল।

৪. বাহ্যিক আরোপিত (Externally imposed)ঃ আপনি একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন সিগারেটের প্যাকেটেই লেখা থাকে, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। অথবা অনেক পণ্যে লেখা থাকে, আপনার পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন, দুটি সন্তানই যথেষ্ট ইত্যাদি। এসব লেখা হয় সরকারের আদেশে। অন্যথায় ঐ পণ্য বাজারজাত করা যেত না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোম্পানির ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছা কোন বিষয় নয়। সরকারের ইচ্ছাতেই বাজারজাতকরণের সময় এ নীতি অবলম্বন করতে হচ্ছে। এটাই হলো বাহ্যিক আরোপিত নীতি বা কৌশল। তেমনই অনেক কোম্পানির অনেক নীতি বা কৌশল অবলম্বন করতে হয়- বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দল যেমন- শ্রমিক ইউনিয়ন, সমাজ, ধর্ম, ভোক্তা ইত্যাদির চাপে অথবা দরকষাকষিতে। যেমন- এদেশের সমাজে মাদক দ্রব্য বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ। এটি সমাজ আরোপিত নীতি। বিষয়টি চিত্রে দেখানো যেতে পারে-

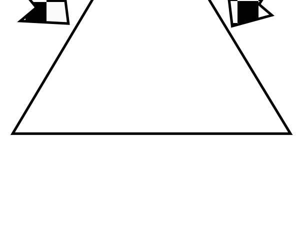

কৌশল ও নীতির মৌলিক প্রকারভেদ

Basic Types of Policy and Strategy

কৌশল ও নীতি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন- যে কোন একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কথা চিন্তা করুন। ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু সেবা প্রদান করা। শাখা স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি করা হলো ব্যাংকের নীতি এবং কৌশল। কীভাবে অধিক গ্রাহক সেবা প্রদান করা যায় তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংককে কিছু সহায়ক নীতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হয়, যেমন- গবেষণামূলক কর্ম। এর সাথে জড়িত হয় কিছু ছোট ছোট পলিসি যেমন- শাখা স্থাপনের জন্য কি বাড়ী ক্রয় করবে নাকি ভাড়া নেবে ইত্যাদি। এখন কথা হলো গ্রাহক সেবা করলেই তো শুধু চলবে না, ব্যাংকের মুনাফাও অর্জন করতে হবে। সে লক্ষ্যেও কিছু নীতি বা কৌশল অবলম্বন করতেহয়। যেমন- আক্রমণাত্মক বিজ্ঞাপন। যে কোন ব্যবসাতেই ভবিষ্যত সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তা থাকে। কারণ ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত এবং পরিবর্তনশীল। সে লক্ষ্যেও কিছু নীতি ও কৌশল থাকতে হয়। যেমন কৃষকদের বিশেষ কৃষি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি করা।

বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে আপনারা নিম্নলিখিত মৌলিক নীতি ও কৌশলগুলো পাবেন-

১. মুখ্য কৌশল ও নীতি - আসল উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্য যে নীতি ও কৌশল অবলম্বন করা হয়। যেমন- গ্রাহক সেবার জন্য অধিক শাখা স্থাপন।
২. সমর্থনকারী কৌশল ও নীতি - সঠিক ও সুষ্ঠু নীতি প্রণয়ন এবং প্রয়োগের জন্য যে নীতি প্রণীত হয়। যেমন- গবেষণামূলক কর্ম।
৩. অপ্রধান কৌশল ও নীতি - যে কৌশল বা নীতি প্রধান নয় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যেমন- বাড়ী ক্রয় না ভাড়া করবে এই নীতি নির্ধারণ।
৪. নিম্ন কৌশল ও নীতি - যে কৌশলসমূহ গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য দরকার। যেমন- গ্রাহক সেবার পাশাপাশি মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন প্রদান।
৫. ভবিষ্যত পরিস্থিতিতে নীতি ও কৌশল - কোন প্রকার সম্প্রসারণ অথবা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে কৌশল নেয়া হয়। যেমন- প্রয়োজনে কৃষি ঋণ প্রদান।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য, নীতি, কৌশল ও লজিষ্টিক্স; কৌশল ও নীতির উৎসসমূহ, কৌশল ও নীতির মৌলিক প্রকারভেদ তুলনা করে একটি চিত্র অংকন করুন।

সারসংক্ষেপ:

যে পরিকল্পনা ইপ্সিত বা অভিপ্রাত ফল অর্জনের জন্য প্রণীত হয়, তাকে লক্ষ বা goal বলে । অভিপ্রেত ফল অর্জনের মাধ্যমে হিসেবে লক্ষ্য রচনা করা হয়। যেমন: উৎপাদন ব্যবস্থাপকের কোন নির্ধারিত সময়ে ১০% উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনাকে লক্ষ্য বলা হয়। নীতি হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নির্দেশকের একটি বিবরণ। অর্থাৎ নীতি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের চিন্তা-ভাবনাকে পরিচালিত করে। যেমন- কর্মচারীদের চাকুরীর শুরুতেই এক বছর শিক্ষানবীস থাকতে হবে- এটা হলো একটি নীতি। কৌশল হলে ভবিষ্যত কার্যাবলীর একটি সাধারণ কর্মসূচী এবং সংগঠনের সার্বিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ ও প্রচেষ্টার প্রয়োগ ও ব্যবহার। অর্থাৎ উদ্দেশ্যে পৌছানোর জন্য সঠিক পথই হলো কৌশল। লজিষ্টিক্স হলো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান। পক্ষান্তরে কৌশল হলো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিরাপত্তামূলক উপায়। পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে লজিষ্টিক্সের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কোন অসুবিধা দেখা দিলে তার বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য কৌশল নেয়া হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরুর পূর্বেই লজিষ্টিক্সের ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু কৌশল পরিকল্পনার বাস্তবায়নের সময় নেয়া হয়। লজিষ্টিক্স কোন স্থায়ী পরিকল্পনা নয়। কিন্তু কৌশল বিশেষ পরিস্থিতির জন্য স্থায়ী উপায় হিসাবে গণ্য করা হয়।

পাঠ-৪.৪ ফলপ্রসূ কৌশল উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ, মুখ্য কৌশলের ক্ষেত্রসমূহ, মুখ্য কৌশলসমূহের উন্নয়ন

Essential Conditions of Successful Development of Strategy, Areas of Basic Strategy, Development of Basic Strategy

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ফলপ্রসূ কৌশল উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মুখ্য কৌশলের ক্ষেত্রসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মুখ্য কৌশলসমূহের উন্নয়ন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ফলপ্রসূ কৌশল উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ

Essential Conditions of Successful Development of Strategy

আপনি খেয়াল খুশী মত সংগঠনের কৌশল নির্ধারণ ও উন্নয়ন করতে পারবেন না। এর জন্য কিছু উপাদান আপনাকে বিবেচনা করতে হবে। এ সকল উপাদান বা শর্ত ছাড়া প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক বা কৌশলগত পরিকল্পনা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এসব শর্তগুলো হলো-

১. **প্রতিষ্ঠানের আত্ম মূল্যায়ন ঃ** সব প্রতিষ্ঠানেরই একটি নিজেস্ব সত্তা থাকে- যে পরিচয় নিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠান পরিচিত হতে চায়। সে তার কার্যকলাপেও একই সত্তাকে বহন করতে চায়। কারবার সংগঠকেরও সেই সত্তা জানতে হবে। প্রধানতঃ দুটি প্রশ্নের আলোকে এ সত্তা জানতে হয়। যেমন- আমাদের ব্যবসা কী?, কোন ধরনের ব্যবসার কাজে আমরা নিয়োজিত?

আপাত দৃষ্টিতে প্রশ্ন দু'টোর উত্তর সহজ মনে হলেও বাস্তবে কঠিন। যেমন- বাংলাদেশ রেলওয়ে রেল ব্যবসায়ে জড়িত কথাটি সঠিক হবে না। কারণ বাংলাদেশ রেলওয়ে সঠিক অর্থে পরিবহন ব্যবসায়ে জড়িত।

২. **ভবিষ্যৎ পরিবেশের মূল্যায়ন ঃ** কৌশল মূলত ভবিষ্যতের জন্যই প্রণয়ন করা হয়। তাই কারবারের ভবিষ্যত পরিবেশের মূল্যায়ন প্রয়োজন। কেননা, যে কোন ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন আসতে পারে। সংগঠন সে পরিবর্তিত পরিবেশে নিজের সামর্থকে কাজে লাগিয়ে সুযোগের সদ্বব্যবহার করতে পারবে কি না- তার মূল্যায়ন করতে হয়।

৩. **সুষ্ঠু সংগঠন কাঠামো ঃ** সাংগঠনিক কাঠামো একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে। এই সাংগঠনিক কাঠামো পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। কোথায় কোন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন, কার কী দায়িত্ব এ সব নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যে বিষয়ে কৌশল প্রণয়ন করা হয়, সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে মত নেয়া প্রয়োজন। দরকার হলে এ ব্যাপারে একটি কমিটিও গঠন করা যেতে পারে।

৪. **সামঞ্জ্যপূর্ণ কৌশলের নিশ্চিতকরণ ঃ** আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে ব্যবহারের বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে জোরালো বিক্রয় উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করবেন। অন্যদিকে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা গত বছরের তুলনায় কমিয়ে দিয়েছেন। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন, উভয় কৌশলই পরস্পরের বিপরীত এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ জোড়ালো বিক্রয় উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্থই হলো বিক্রয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই অধিক বিক্রয়ের লক্ষ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল নেয়া যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আপনি নিয়েছেন উৎপাদন কমানোর কৌশল যা সামঞ্জ্যপূর্ণ নয়। তাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক বিভাগের কৌশলগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

৫. **পরিস্তিতি প্রেক্ষিত বিকল্প কৌশলের প্রয়োজনীয়তা ঃ** কৌশল প্রণয়ন করা হয় ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু আপনি জানেন ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত এবং পরিবর্তনশীল। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কিছু বিকল্প কৌশলের প্রয়োজন হয়।

যেমন- আপনার কারখানার মেশিনগুলো বিদ্যুৎ চালিত। কিন্তু যে কোন সময় বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে আপনার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সে কারণে আপনি বিকল্প পন্থা হিসেবে কারখানায় একটি জেনারেটর স্থাপন করতে পারেন, যা দিয়ে বিদ্যুৎ বিপর্যয়কালীন সময়ে উৎপাদন চালানো যায়।

মুখ্য কৌশলের ক্ষেত্রসমূহ

Areas of Basic Strategy

সংগঠনের কতগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে মুখ্য কৌশল গ্রহণ করতে হয়। সংগঠনের মূল্য কৌশলের ক্ষেত্রসমূহ নানারকম হয়ে থাকে। সেগুলো হলো নিম্নরূপ-

১. নতুন বা পরিবর্তিত পণ্য ঃ ক্রেতাদের চাহিদা পূরণের মাধ্যমেই একটি সংগঠন টিকে থাকে। কাজেই ক্রেতাদের চাহিদা মোতাবেক নতুন এবং পরিবর্তিত পণ্য উৎপাদন এবং লাভে বিক্রয় করার কৌশল নির্ধারণ করতে হয়। যেমন- এক সময় কলের গানের খুব প্রচলন ছিল। তারপর আসে রেডিও, ক্যাসেট প্লেয়ার, টেলিভিশন ইত্যাদি। এর ফলে এককালের কলের গান আজ ইতিহাস। অর্থাৎ চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে এসেছে নতুন পণ্য। তাই একজন ব্যবসায়ীর সবসময় সময়ের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয় এবং উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

২. বিপণন ঃ পণ্য উৎপাদনের পর তা ক্রেতাদের নিকট পৌঁছে দেয়া পর্যন্ত যাবতীয় কার্যাবলী হলো বিপণন। কাজেই এ ক্ষেত্রেও কিছু কৌশল গ্রহণ করতে হয়। এতে ক্রেতারা উৎপাদিত পণ্য গ্রহণে আগ্রহী হয়। এক্ষেত্রে যেসব কৌশল নেয়া হয় সেগুলো হলো-

- পণ্য নির্বাচন। অর্থাৎ আপনাকে ঐ পণ্যই উৎপাদন করতেহবে যা ক্রেতাগণ ক্রয় করতে আগ্রহী হবেন।
- পণ্য উন্নয়ন কৌশল ও সম্প্রসারণ কৌশল। ক্রেতাদের পছন্দের সাথে তাল মিলিয়ে পণ্যের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ করতে হবে। যেমন- টুথপেস্টের কথা। এক সময় ছিল শুধু টুথপেস্ট, তারপর একে একে এলো ফ্লোরাইড, নিম এবং জেল টুথপেস্ট। এগুলো কিন্তু সবই ক্রেতাদের পছন্দ অনুযায়ী পণ্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কৌশল।
- মূল্য নির্ধারণ কৌশল। ক্রেতারা যেন ন্যায্য মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারে এজন্য মূল্য নির্ধারণের কৌশল অবলম্বন করতে হয়। মূল্য কী- খরচের উপর একটি নির্দিষ্ট লাভ ধরে করবে, না প্রতিযোগীদের ন্যায় মূল্য নির্ধারণ করবে এসব সিদ্ধান্ত।
- বিক্রয় প্রসার মূলক কৌশল। অর্থাৎ কীভাবে বিক্রয় বাড়াবে। জোড়ালো বিজ্ঞাপন দিয়ে না কি ব্যক্তিগতভাবে বিক্রয়ের মাধ্যমে, না কি অন্য কোন ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধতি অবলম্বন করে। এসব সিদ্ধান্ত নেয়াই হলো বিক্রয় প্রসার কৌশল।
- পণ্য বিতরণ সংক্রান্ত কৌশল। পণ্য কি সরাসরি ভোক্তাদের কাছে বিক্রী করবে না কি পাইকার এবং খুচরা ব্যবসায়ীদের দ্বারা, না কি এজেন্ট দ্বারা, এসব সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে নিতে হবে।

৩. প্রবৃদ্ধি ঃ একটি কোম্পানি অনেক পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করতে পারে ক্রেতার সন্তুষ্টির জন্য। কিন্তু সব পণ্য সমানভাবে লাভজনক নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে কৌশল ঠিক করতেহয়- কোন্ কোন্ পণ্যের উৎপাদনের উপর বেশি গুরুত্ব দিবে এবং প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। যেমন একটি বইয়ের দোকানের কথাই ধরুন। আপনি জানেন যে কোন এক লেখকের বই পাঠকরা খুব পছন্দ করছে। কাজেই সে পাঠকের বই আপনি বেশি করে মজুদ রেখে অন্যান্য বই কিছু কম করে রাখলেন। কারণ সে বিশেষ লেখকের বই বিক্রি করেই আপনার আসল প্রবৃদ্ধি আসবে।

৪. অর্থ সংক্রান্ত ঃ অর্থ ব্যবসায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ব্যবসায়ের যে কোন কাজেই অর্থের প্রয়োজন। কাজেই এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতি ও কৌশল থাকা প্রয়োজন। যেমন- একটি প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত কৌশলগুলো ঠিক করে রাখবে-

- মূলধন কিভাবে সংগ্রহ করবে। ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে, শেয়ার বিক্রয় করে, নাকি সম্পত্তি বিক্রয় করে ইত্যাদি।
- মুনাফার নীতিমালা কি হবে। মূলধন অনুপাতে মুনাফা বণ্টন, নাকি প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফা বণ্টন করবে ইত্যাদি।
- অপচয় কিভাবে নির্ধারণ করবে। সম্পত্তির ক্রয়মূল্যের একটি নির্দিষ্ট হারে, নাকি মূল্যকে সম্পত্তির জীবন দিয়ে ভাগ করে যা আসে- সে পদ্ধতিতে ইত্যাদি।
- অন্যান্য খরচ কিভাবে করবে। যেমন- আতিথেয়তা, ভ্রমণ, বিজ্ঞান ইত্যাদি খরচ।

৫. **সাংগঠনিক ঃ** ব্যবসায় সংগঠনটি কী ধরনের হবে তা ঠিক করতে হবে। কারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সংগঠন এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এ সংক্রান্ত নিচের কৌশলসমূহ ঠিক করতে হয়-

▪কর্তৃত্ব কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের ধরন। অধীনস্তদের আদৌ কোন ক্ষমতা প্রদান করবে- কী করবে না, করলে কি পরিমাণ।

▪বিভাগীয়করণের ধরন। কার্যের উপর না উৎপাদিত দ্রব্যের উপর ভিত্তি করে বিভাগীয়করণ করবে ইত্যাদি।

▪সাংগঠনিক কাঠামো। কে কোন দায়িত্ব পালন করবে তা ঠিক করে রাখতে হবে।

▪বিশেষজ্ঞ কর্মীর প্রয়োজন। কিন্তু কাজ যেমন- কম্পিউটার চালানো সবার পক্ষে সম্ভব নয়। এসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। তাই কোন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করবে তা ঠিক করে রাখতে হবে।

৬. **শ্রমিক কর্মী সংক্রান্ত ঃ** শ্রমিক কর্মচারীরাই একটি সংগঠনের প্রাণ। কারণ সুদক্ষ কর্মীবাহিনীই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য অর্জন করতে সহায়তা করে। কাজেই কর্মী সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কৌশল প্রণয়ন খুবই বাঞ্চনীয়-

▪কর্মচারী নির্ধারণ

▪কর্মচারী নিয়োগ

▪কর্মচারী উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

▪বেতন, মজুরী, বোনাস, ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন

▪কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা প্রদান ও মনোবল উন্নয়ন

▪শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক

▪কাজ মূল্যায়ন ও মেধা নির্ধারণ

▪পদোন্নতি, পদাবনতি, ছাটাই সংক্রান্ত নীতিমালা গ্রহণ।

৭. **ক্রয় সংক্রান্ত ঃ** ব্যবসায় ক্রয় বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পণ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল ক্রয় করতে হয়, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি অথবা অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় করতে হয়। কাজেই এ সংক্রান্ত কৌশলও ঠিক করতে হয়। যেমন-

▪কাঁচামাল উৎপাদন করবে না ক্রয় করবে

▪সরবরাহকারী নির্বাচন ইত্যাদি

৮. **গণ সংযোগ ঃ** ব্যবসায় সংগঠনের ব্যবস্থাপনাকে সমাজের বিভিন্ন লোক ও সংগঠনের যোগাযোগ রাখতে হয়। এটাও ব্যবসায়ের একটা দায়িত্ব। কাজেই এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কৌশল ঠিক করতে হয়। যেমন-

▪সামাজিক বিভিন্ন কাযক্রমে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত

▪জনগণকে পণ্যের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে জানানো

▪প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান ইত্যাদি।

মুখ্য কৌশলসমূহের উন্নয়ন

Development of Basic Strategy

একটি পরিবারে তিনটি সন্তান। বাবা মায়ের ইচ্ছে বড় সন্তান সাহিত্যিক, ছোট সন্তান ব্যবসায়ী এবং মেঝো সন্তান ডাক্তার হবে। সেই লক্ষ্যে বড় সন্তানকে মানবিক বিষয়ে, ছোট সন্তানকে বাণিজ্য বিষয়ে এবং মেঝো সন্তানকে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনা করাচ্ছে। এখানে কিন্তু প্রতিটি সন্তান ভবিষ্যতে কী হবে সেই লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য উপযুক্ত বিষয়ে পড়াশুনার কৌশল উন্নয়ন করছে।

তেমনি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও কৌশল উন্নয়নের জন্য কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হয়। সঠিক প্রশ্নই ব্যবসায়ের কোন ক্ষেত্রে কী কৌশলের প্রয়োজন তা ঠিক করে দেবে। ব্যবসায়ের মুখ্য ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে−নতুন পণ্য ও সেবা সংক্রান্ত,বিপণন সংক্রান্ত, উৎপাদন সংক্রান্ত এবং কর্মচারী সংক্রান্ত। এখন কীভাবে মুখ্য কৌশলগুলির কয়েকটির উন্নয়ন করা সম্ভব- তা নিচে আলোচনা করা হলো:

(ক) **পণ্য ও সেবার কৌশলসমূহ ঃ** পণ্য ও সেবার কৌশলসমূহ উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু বিষয়ের দিকে আপনাকে দৃষ্টি দিতে হবে। সেই বিশেষ দিকগুলো হলো-

১. ব্যবসায়ের ধরন কি? অর্থাৎ আপনাকে জানতে হবে আপনি ব্যবসায়ী না শিল্পপতি না উভয়ই। অর্থাৎ আপনি কি শুধু ব্যবসার সাথে জড়িত না শিল্প উৎপাদনের সাথেও জড়িত। যদি আপনার শিল্প থাকে তবে এখানে কি আপনি এক, না একাধিক পণ্য উৎপাদন করছেন? এটা কি একটা প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প? ইত্যাদি প্রশ্ন করে আপনার ব্যবসায়ের রূপ জানতে হবে।

২. কারা ক্রেতা? এখানে আপনাকে জানতে হবে কাদের জন্য আপনার পণ্য উৎপাদন করছেন? উদাহরণস্বরূপ আপনার শিল্প একটি পোশাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। কাদের পোশাক বানাবেন? মহিলাদের? কোন বয়সের? কিশোরী, যুবতী নাকি বৃদ্ধা ইত্যাদি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আপনাকে জানতে হবে।

৩. ক্রেতারা কী চায়? আপনাকে জানতে হবে ক্রেতারা কি গুণগত পণ্য চায় নাকি ফ্যাশন পণ্য চায় অথবা উভয়ই চায়? ক্রেতাদের চাহিদাকে লক্ষ্য হিসাবে ধরে তারপর আপনাকে উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৪. ক্রেতারা কী দামে কী পরিমাণ পণ্য ক্রয় করবে? আপনি যে কোন দামে বাজারে পণ্য ছাড়লেই চলবে না। আপনাকে দেখতে হবে ক্রেতারা কী দামে কী পরিমাণ পণ্য কিনতে ইচ্ছুক। তার উপরই নির্ভর করবে আপনি কী ধরনের পণ্য উৎপাদন করবেন। অর্থাৎ ক্রেতাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য আপনাকে পণ্য উৎপাদনের কৌশল প্রণয়নে বিবেচনায় আনতে হবে।

৫. নতুন পণ্য উন্নয়নে আপনি কতটা আগ্রহী? আপনি কি নিজ ধারণা হতে পণ্য উৎপাদন করতে চান নাকি প্রতিযোগিরা যে পণ্য উৎপাদন করবে আপনিও তাই করবেন? অবশ্য এটা নির্ভর করবে পণ্য উন্নয়ন গবেষণা করার ক্ষমতা আপনার কতটুকু আছে এর উপর।

৬. ক্রেতাদের প্রয়োজন মেটাতে কি কি সুবিধা আছে এবং আপনি কী ধরনের ব্যতীক্রমধর্মী সুবিধা দিতে পারেন। যেমন- আপনি অন্যান্যদের চাইতে আধুনিক যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। যার ফলে প্রতিযোগীদের চাইতে ক্রেতারা আপনার পণ্য বেশি পছন্দ করবে। অথবা আপনি পণ্যের বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করছেন যার ফলে ক্রেতারা আপনার পণ্য গ্রহণে বেশি আগ্রহী হবেন।

৭. বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতা কী ধরনের হবে? আধুনি বিশ্বে প্রতিযোগীতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আজ যে পণ্য আপনি একাই বিক্রয় করছেন কাল তা নাও থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে পূর্বাণুমান থেকে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের কৌশল ঠিক করে রাখা প্রয়োজন।

৮. ক্রেতাদের প্রয়োজন মেটাতে সামর্থ্য কতটুকু? শুধু যন্ত্রপাতি থাকলেই ক্রেতাদের প্রয়োজন মেটাতে আপনি সক্ষম হবেন এমন কথা নেই। আপনাকে জানতে হবে যথেষ্ট আর্থিক সামর্থ্য এবং সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার সহজলভাতা আপনার আছে কিনা।

৯. কী পরিমাণ মুনাফা আশা করা যায়? আপনি লোকসান করে ক্রেতাদের প্রয়োজন মেটাবেন? নিশ্চয়ই না। কাজেই আপনাকে এমন কৌশল নিতে হবে যেন ক্রেতাদের সন্তুষ্ট ও করা যায় আবার মুনাফাও আয় করা যায়।

১০. কৌশলের মৌলিক আকার কী ধরনের হবে? অর্থাৎ আপনাকে ঠিক করতে হবে পণ্যের বিচিত্রকরণ কৌশল সম্বন্ধে। আপনি কি একটি মাত্র পণ্য উৎপাদনে সীমিত থাকবেন না নতুন নতুন পণ্য উননয়ন ও সম্প্রসারণ অথবা বাজার সম্প্রসারণ করবেন ইত্যাদি।

(খ) **বিপণন সংক্রান্ত কৌশল উন্নয়ন**: পণ্য উৎপাদনের পর সে পণ্য কী পরিমাণ বিক্রী হবে তা অনেকাংশেই নির্ভর করে বিপণন কৌশলের উপর। তাই বিপণন কৌশলসমূহের উন্নয়ন করতে হয় খুব সাবধানে। এক্ষেত্রে যে সব প্রশ্নের উত্তর জানতে হয় তাহলো-

১. পণ্যের ক্রেতা কারা এবং তারা কেন পণ্য ক্রয় করে? ধরুন আপনি একটি পাউরুটির কারখানা করেছেন। এখন আপনাকে জানতে হবে কারা এ পণ্য ক্রয় করবে। উৎপাদিত পণ্য হোটেল, রেস্তোরা বা হাসপাতালে সরবরাহের জন্য

নাকি দোকানে বিক্রয়র জন্য? ক্রেতাদের অবস্থান কোথায় ইত্যাদি।

২. ক্রেতারা কীভাবে ক্রয় করবে? সরাসরি, এজেন্টদের মাধ্যমে, শো-রুম থেকে নাকি পাইকারী অথবা খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে?

৩. কীভাবে বিক্রয় প্রভাবিত করা উত্তম? এটা আধুনিক বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতাদের প্রভাবিত করেও হতে পারে আবার সরাসরি ভোক্তাদের কাছেও অল্প দামে বিক্রয় করা যেতে পারে।

৪. অন্যান্য প্রতিযোগীদের চেয়ে অতিরিক্ত কী সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে? যেমন, বিক্রয়োত্তর সেবার নিশ্চয়তা প্রদান, বৃহদাকার বিতরণ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

৫. মূল্য নির্ধারণের সর্বোত্তম পলিসি কোনটি? এ প্রশ্নটি খুবইগুরুত্বপূর্ণ। কারণ মূল্যের উপর অনেক সময় বিক্রয় নির্ভর করে। মুল্য নির্ধারণের জন্য সাধারণত পণ্যের মান, চাহিদা ও ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার উপর নির্ভর করা হয়।

(গ) **কৌশলসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন**: আপনি একটি কৌশল প্রণয়ন করলেন। কৌশলটি হলো, আপনার পণ্য যে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অথবা তার বেশি বিক্রয় করবে তাকে নির্দিষ্ট হারে কমিশন দেবেন। কিন্তু এ কৌশলটির কথা বিক্রয় বিভাগ জানেন না, হিসাব তেমনিও জানেন না। ফলে কৌশলটির বাস্তবায়ন হয়নি। এটিকে কোন ফলপ্রসূ কৌশল বলা যাবে কি? নিশ্চয় বলা যাবে না। কাজেই এক্ষেত্রে কৌশলটি যেন বাস্তবায়িত হয় সে পদক্ষেপ আপনার নেয়া উচিত। যেমন-

১. কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিদের কৌশলটি বিস্তারিত জানিয়ে দেয়া উচিত।

২. সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত। যেমন- কৌশলটি যেমনই হোক না কেন তা সবাইকে গ্রহণ করার মানসিকতা থাকতে হবে, উপযুক্ত লোকজন নিয়োগ দিতে হবে ইত্যাদি।

৩. ব্যবসায় পরিবর্তনশীল। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কৌশলসমূহ পর্যালোচনা করে উপযুক্ত কৌশল প্রণয়ন করতে হবে।

৪. কৌশল বাস্তবায়নের জন্য কার কী দায়িত্ব তা ঠিক রাখতে হবে। অর্থাৎ উপযুক্ত সংগঠন কাঠামো তৈরি করতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ফলপ্রসূ কৌশল উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ, মুখ্য কৌশলের ক্ষেত্রসমূহ , মুখ্য কৌশলসমূহের উন্নয়নচিত্র অংকন করুন।

সারসংক্ষেপ:

আপনি খেয়াল খুশী মত সংগঠনের কৌশল নির্ধারণ ও উন্নয়ন করতে পারবেন না। এর জন্য কিছু উপাদান আপনাকে বিবেচনা করতে হবে। এ সকল উপাদান বা শর্ত ছাড়া প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক বা কৌশলগত পরিকল্পনা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এসব শর্তগুলো হলো-প্রতিষ্ঠানের আত্ম মূল্যায়ন , ভবিষ্যৎ পরিবেশের মূল্যায়ন, সুষ্ঠু সংগঠন কাঠামো , সামঞ্জস্যপূর্ণ কৌশলের নিশ্চিতকরণ , পরিস্থিতি প্রেক্ষিত বিকল্প কৌশলের প্রয়োজনীয়তা; । সঠিক প্রশ্নই ব্যবসায়ের কোন ক্ষেত্রে কী কৌশলের প্রয়োজন তা ঠিক করে দেবে। ব্যবসায়ের মুখ্য ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে– নতুন পণ্য ও সেবা সংক্রান্ত, বিপণন সংক্রান্ত, উৎপাদন সংক্রান্ত এবং কর্মচারী সংক্রান্ত। এখন কীভাবে মুখ্য কৌশলগুলির কয়েকটির উন্নয়ন করা সম্ভব- তা নিচে আলোচনা করা হলো:পণ্য ও সেবার কৌশলসমূহ , বিপণন সংক্রান্ত কৌশল উন্নয়ন, কৌশলসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।

পাঠ-৪.৫ লজিস্টিক্সের গুরুত্ব, লজিস্টিক্স নির্ধারণের বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ, কৌশল ও লজিস্টিক্সের তুলনা

Importance of Logistics, Steps of Logistics, Comperision Between Logistics and Strategy

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- লজিস্টিক্সের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- লজিস্টিক্স নির্ধারণের বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কৌশল ও লজিস্টিক্সের তুলনা করতে পারবেন।

লজিস্টিক্সের গুরুত্ব

Importance of Logistics

আপনাকে যদি কোন প্রকার খাওয়াদাওয়া ও বিশ্রাম ছাড়া একটানা কাজ করতে বলা হয়, আপনি কি পারবেন? নিশ্চয়ই নয়। কারণ শরীরে শক্তি সঞ্চয়ের জন ্যসময মত খাদ্য খেতে হয়। আর তারপরই সম্ভব হয় অধিক পরিশ্রম করা। অন্যথায় নয়। অথবা আপনাকে বলা হলো প্রতির্দিন ১০০০ ইউনিট উৎপাদন করতে। কিন্তু ১০০০ ইউনিট উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অথবা লোকবল সরবরাহ করা হয়নি। তালে কি সম্ভব আপনার পক্ষে প্রতিদিন ১০০০ ইউনিট উৎপাদন করা? নিশ্চয়ই না। তাহলে বিষয়টি এই দাঁড়াচ্ছে যে কোন কাজ সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত সম্পদ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়। আর এটাই হলো লজিস্টিক্স। লজিস্টিক্স পরিকল্পনা প্রণয়নে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কখন কী পরিমাণ সম্পদের যোগান দেয়া হবে তা আগে থেকেই বিবেচনা করতে হয়।

আপনি একটি পরিবারের কথাই চিন্তা করুন। পরিবারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন একটি ঘর, সদস্যদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন খাদ্য, পরিধানের জন্য প্রয়োজন বস্ত্র, সুস্থ থাকার প্রয়োজন চিকিৎসা ও ঔষধ, ঘরে প্রয়েজন আসবাপত্র, যাতায়াতের জন্য প্রয়োজন যানবাহন ইত্যাদি। একটু খেয়াল করে দেখুন, এদের কোন একটির অভাব থাকলেই পরিবার স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে না। তাই পরিবারের পরিকল্পনায় এসব বিষয় বিবেচনা করতেহয়। তেমনি একটি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে লজিস্টিক্সের রয়েছে অনেক গুরুত্ব। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চালাতে ঘর, আসবাবপত্র, থেকে শুরু করে কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তবেই ব্যবসায়ের সফলতা আসতে পারে? অন্যথায় ব্যবসায়ের আসল উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হবে না।

লজিস্টিক্স নির্ধারণের বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ

Steps of Logistics

মনে মনে একটি বাস্তব চিত্র কল্পনা করুন। আপনি একটি পোশাক শিল্পের মালিক। এ শিল্পে ছেলেদের পোশাক তৈরি করা হয়। প্রতি অর্থ বছরে উৎপাদিত সকল পণ্য বিক্রয় করে পরবর্তী বছরে নতুন করে পরিকল্পনা করা হয়। এ বছর ২,০০,০০০ ইউনিট শার্ট তৈরি এবং বিক্রয় করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে যা গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ। এখন এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে কাজগুলো করতে হবে তাহলো-

১। ২,০০,০০০ ইউনিটকে সময়ওয়ারী ভাগ করে নিয়ে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যেমন- কাপড়,সুতা, ইত্যাদি সরবরাহের

পরিকল্পনা নেয়া। অর্থের যোগান দেয়া, প্রয়োজনে অতিরিক্ত মেশিন স্থাপন করা, আরও লোকবল নিয়োগ করা, বিক্রয় প্রসার করা, অতিরিক্ত পরিবহনের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

২। কার্যসমূহ নির্ধারণ করার পর এদের মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা স্থাপন করতে এবং যেন বোঝা যায় কোনটি আগে এবং কোনটি পরে করতে হবে। যেমন- মেশিন স্থাপনের প্রয়োজন হলে আগে তা করতে হবে, এরপর মেশিন চালানো জন্য উপযুক্ত লোক নিয়োগ করতে হয়।

৩। কাজের ধারাবাহিকতা স্থাপন করায় একটি বিষয়ে পরিষ্কার হয় যে, কোন স্তরে কী পরিমাণ সম্পদ অর্থাৎ লজিস্টিক্সের প্রয়োজন হবে। যেমন- উৎপাদনের শুরুতে অধিক সম্পদ অর্থাৎ অর্থ, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। কিন্তু উৎপাদনের শেষে অধিক সম্পদের প্রয়োজন হয় পণ্য বিতরণ এবং বিক্রয় প্রসার কর্মসূচীতে। কাজেই এ বিষয়টি এখানে নির্ধারণ করতে না পারলে প্রতিটি স্তরে উপযুক্ত লজিস্টিক্সের ব্যবস্থা করা যায় না। ফলে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অসুবিধা হতে পারে।

৪। প্রতিটি পদক্ষেপ কী পরিমাণ সম্পদের প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণের পর, আপনাকে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, সব সম্পদ সবসময় সহজলভ্য নাও হতে পারে। যেমন- আপনি যদি সুতা উৎপাদন করতে চান তাহলে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অর্থাৎ তুলা বছরের একটি বিশেষ সময়ে সংগ্রহ করে রাখতে হবে। কারণ, তুলা সারা বছর উৎপাদিত হয় না। কাজেই সঠিক সময়ে সঠিক সম্পদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। এরপর প্রতিটি কার্যের সময়কাল ঠিক করতে হয়। যেমন- আপনি স্থির করলেন ১০০০ ইউনিট শার্ট উৎপাদন করবেন। তাহলে আপনাকে ঠিক করতে হবে কাপড় কাটতে কতদিন, সেলাইতে কতদিন, ফিনিশিং কাজে কতদিন লাগবে তা ঠিক করে নেয়া। ফলে আপনি ঠিক সময়ে সঠিক সম্পদ সরবরাহ করতে পারবেন। এখন কাপড় কাটার সময় পার হয়ে যাবার পর কাপড় সরবরাহ করার অর্থই হলো উৎপাদন ব্যাহত হওয়া।

৬। সময়কাল নির্ধারণ করলেই চলবে না। সঠিক সময়সূচী নির্ধারণ করতে হবে। যেমন, জানুয়ারির ১ তারিখ কাপড় কাটা শুরু হবে শেষ হবে ১০ তারিখ, ১১ তারিখ সেলাই শুরু হলে শেষ হবে ২০ তারিখ, ২১ তারিখ ফিনিশিং কাজ শুরু হলে শেষ হবে ৩০ তারিখ ইত্যাদি, তাহলে উপযুক্ত সম্পদের সরবরাহ বজায় রাখা সম্ভব।

কৌশল ও লজিস্টিক্সের তুলনা

Comperision Between Logistics and Strategy

কৌশল ও লজিষ্টিক্স উভয়ই পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কোন একটির অনুপস্থিতিতে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। পূর্বের উদাহরণে আপনি এ বছরের লক্ষ্য মাত্রা দ্বিগুণ করেছেন। আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিক্রয় বাড়াবেন। সে লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন এবং খরচ বহন করছেন টাকার যোগান দিয়ে। এক্ষেত্রে আপনি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিক্রয় বাড়ানোর সিদ্ধান্তটি একটি কৌশল এবং বিজ্ঞাপন খরচের জন্য যে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিচ্ছেন তা হলো লজিষ্টিক্স। তাহলে উভয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ এই দাঁড়ায় যে,

- লজিষ্টিক্স হলো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান। পক্ষান্তরে কৌশল হলো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিরাপত্তামূলক উপায়।
- পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে লজিষ্টিক্সের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কোন অসুবিধা দেখা দিলে তার বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য কৌশল নেয়া হয়।
- পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরুর পূর্বেই লজিষ্টিক্সের ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু কৌশল পরিকল্পনার বাস্তবায়নের সময় নেয়া হয়।
- লজিষ্টিক্স কোন স্থায়ী পরিকল্পনা নয়। কিন্তু কৌশল বিশেষ পরিস্থিতির জন্য স্থায়ী উপায় হিসাবে গণ্য করা হয়।

বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা, এতদসংক্রান্ত গবেষনা, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রযুক্তি আমদানির সুযোগ প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত পরিবেশকে ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তিগত পরিবেশ বলে। এ প্রযুক্তিগত পরিবেশ ব্যবসায়ের ধারা ও গতি প্রকৃতিকে দ্রুতই

পরিবর্তন করে দিতে পারে। আর এর ফলেই কম খরচে উন্নতমানের পণ্য ও সেবা উৎপাদন করা সম্ভব হয়। শিল্প বিপ্লবের পিছনেও ছিল মূলত এ প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রভাব। চীন, জাপান, ব্রিটেনসহ অন্যান্য উন্নত দেশের ব্যবসায়িক সাফল্যের মূলেও রয়েছে এ প্রযুক্তিগত পরিবেশ। বিজ্ঞানের মাধ্যমে নতুন নতুন তত্ত্ব ও জ্ঞানের আবিষ্কার ঘটে, আর প্রযুক্তির মাধ্যমে আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও জ্ঞানকে মানুষের প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করা হয়। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কম খরচে উন্নত মানের নতুন নতুন পণ্য ও সেবার উৎপাদন এবং সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগের ফলে ব্যবসায়ের পরিধিও অনেক প্রসার ঘটেছে। নিচে ব্যবস্থাপনার উপর প্রযুক্তিগত পরিবেশের প্রভাব আলোচনা করা হলো:

১. বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা: কারিগরি শিক্ষা বলতে হাতে কলমে শিক্ষাকে বুঝায়। কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ বিদ্যমান থাকলে দেশে উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ী সৃষ্টি এবং দক্ষ শ্রমিক-কর্মী সহজলভ্য হয়। যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার রয়েছে সেখানে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান সহজেই গড়ে উঠে ও বিদ্যমান শিল্পের সহজ সম্প্রসারণ সম্ভব হয়। ফলে একটি ব্যবসায়বান্ধব পরিবেশ গড়ে উঠে। অপরদিকে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার অভাবে ব্যবসায়ে প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখা যায়।

২. বিজ্ঞান ও গবেষনাধর্মী প্রতিষ্ঠান: বিজ্ঞান ও গবেষনাধর্মী প্রতিষ্ঠানসমূহের কারনে নতুন নতুন কলা-কৌশল আবিষ্কার ও ব্যবহার সহজতর হয়। দেশের প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি বিবেচনায় এন সময়োপযোগী ও স্থানোপযোগী প্রযুক্তির আবিষ্কার ও ব্যবহার সম্ভব হয়। এর ফলে ব্যবসায়ের জন্য নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়। এছাড়া নতুনত্বের উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ধারা বহাল থাকলে ব্যবসায়ের প্রভূত উন্নতি সাধন সম্ভব হয় এবং পরিবর্তনশীল চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে ব্যবসায়িক সাফল্য ধরে রাখার সুযোগ তৈরি হয়। পাশাপাশি ব্যবসায়ে নতুন ধারা সংযোজন করার সুযোগ তৈরি হয়।

৩. উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারকারী ও সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান: উন্নত প্রযুক্তি উৎপাদনের গতি ত্বরান্বিত করে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারকারী ও সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান নতুন ও আকর্ষণীয় পণ্য উৎপাদনে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে এ সব প্রযুক্তি বিবেচনায় আনতে হয়।

৪. প্রযুক্তি আমদানির সুযোগ: দেশে উন্নত ও নতুন নতুন পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি আমদানি করতে হয়। সেক্ষেত্রে প্রযুক্তি আমদানির জন্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা বিবেচনাপূর্বক একজন ব্যবসায়ী ব্যবসায় স্থাপন বা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন।

৫. বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা ব্যবস্থা: দেশে বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা ব্যবস্থা দক্ষ কর্মী গঠনে এবং পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আর দক্ষ কর্মী অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এগুলোর সহজলভ্যতা ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে বেগবান করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	লজিস্টিক্সের গুরুত্ব, লজিস্টিক্স নির্ধারণের বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ, কৌশল ও লজিস্টিক্সের তুলনা করে একটি চিত্র অংকন করুন।

সারসংক্ষেপ:

যে কোন কাজ সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত সম্পদ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়। আর এটাই হলো লজিস্টিক্স। লজিস্টিক্স পরিকল্পনা প্রণয়নে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কখন কী পরিমাণ সম্পদের যোগান দেয়া হবে তা আগে থেকেই বিবেচনা করতে হয়।

কৌশল ও লজিষ্টিক্স উভয়ই পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কোন একটির অনুপস্থিতিতে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। পূর্বের উদাহরণে আপনি এ বছরের লক্ষ্য মাত্রা দ্বিগুণ করেছেন। আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিক্রয় বাড়াবেন। সে লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন এবং খরচ বহন করছেন টাকার যোগান দিয়ে। এক্ষেত্রে আপনি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিক্রয় বাড়ানোর সিদ্ধান্তটি একটি কৌশল এবং বিজ্ঞাপন খরচের জন্য যে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিচ্ছেন তা হলো লজিষ্টিক্স।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. পরিকল্পনার সংজ্ঞা দিন।
২. উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. পরিকল্পনার প্রকৃতি বর্ণনা করুন।
৪. পরিকল্পনার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
৫. পরিকল্পনায় সংজ্ঞা দিন। পরিকল্পনার পদক্ষেপ সমূহ বর্ণনা করুন।
৬. পরিকল্পনাা প্রকারভেদ আলোচনা করুন।
৭. উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণনা করুন।
৮. কৌশল, নীতিও লজিষ্টিক্সের মধ্যে কী সম্পর্ক আলোচনা করুন?
৯. কৌশল ও নীতির উৎসসমূহ কিকি?
১০. সামঞ্জস্যপূর্ণ কৌশল বলতে কি বুঝায়?
১১. লজিষ্টিক্সের পদক্ষেপ সমূহ কিকি?
১২. কৌশল ও লজিষ্টিক্স-এর তুলনা করুন।
১৩. কৌশল ও লজিষ্টিক্স বলতে কি বোঝেন?

রেফারেন্স বইসমূহ

- Ricky W. Griffin, Management,12th Edition, AITBS Publication, New Delhi.
- Introduction to Management, Dr.M A Mannan & Dr. Md. Ataur Rahman
- Fundamental of Management (10th Edition), Stephen P Robbins, Mary Coulter, David A DeCenzo, Harlow Publisher, England Pearson (2017).